একালের কবিতা সঞ্চয়ন

প্রাক্-স্নাতক পাঠপর্ষৎ : বাংলা
কর্তৃক সংকলিত

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
২০০৩

সূচীপত্র

জীবনানন্দ দাশ

(১৮৯৯)

আট বছর আগের একদিন

শোনা গেল লাসকাটা ঘরে
নিয়ে গেছে তারে;
কাল রাতে—ফাল্গুনের রাতের আঁধারে
যখন গিয়েছে ডুবে পঞ্চমীর চাঁদ
মরিবার হ'লো তার সাধ;

বধূ শুয়েছিল পাশে—শিশুটিও ছিলো;
প্রেম ছিলো, আশা ছিলো—জোৎস্নায়—তবু সে দেখিল
কোন্ ভূত ? ঘুম কেন ভেঙে গেল তার ?
অথবা হয়নি ঘুম বহুকাল—লাসকাটা ঘরে শুয়ে ঘুমায় এবার।
এই ঘুম চেয়েছিলো বুঝি !
রক্তফেনামাখা মুখে মড়কের ইঁদুরের মতো ঘাড় গুঁজি
আঁধার ঘুঁজির বুকে ঘুমায় এবার ;
কোনোদিন জাগিবে না আর।

'কোনোদিন জাগিবে না আর
জানিবার গাঢ় বেদনার
অবিরাম—অবিরাম ভার
সহিবে না আর—'
এই কথা বলেছিলো তারে
চাঁদ ডুবে চ'লে গেলে—অদ্ভুত আঁধারে
যেন তার জানালার ধারে
উটের গ্রীবার মতো কোনো এক নিস্তব্ধতা এসে।

তবুও তো পেঁচা জাগে;
গলিত স্থবির ব্যাং আরো দুই মুহূর্তের ভিক্ষা মাগে
আরেকটি প্রভাতের ইশারায়—অনুমেয় উষ্ণ অনুরাগে।

টের পাই যূথচারী আঁধারের গাঢ় নিরুদ্দেশে
চারিদিকে মশারির ক্ষমাহীন বিরুদ্ধতা;
মশা তার অন্ধকার সঙ্ঘারামে জেগে থেকে জীবনের স্রোত ভালোবাসে।

রক্ত ক্লেদ বসা থেকে রৌদ্রে ফের উড়ে যায় মাছি;
সোনালি রোদের ঢেউয়ে উড়ন্ত কীটের খেলা কতো দেখিয়াছি।

ঘনিষ্ঠ আকাশ যেন—যেন কোন্ বিকীর্ণ জীবন
অধিকার ক'রে আছে ইহাদের মন;
দুরন্ত শিশুর হাতে ফড়িঙের ঘন শিহরণ
মরণের সাথে লড়িয়াছে;
চাঁদ ডুবে গেলে পর প্রধান আঁধারে তুমি অশ্বত্থের কাছে
এক গাছা দড়ি হাতে গিয়েছিলে তবু একা-একা;
যে-জীবন ফড়িঙের, দোয়েলের—মানুষের সাথে তার হয়নাকো দেখা
এই জেনে।

অশ্বত্থের শাখা
করেনি কি প্রতিবাদ? জোনাকির ভিড় এসে সোনালি ফুলের স্নিগ্ধ ঝাঁকে
করেনি কি মাখামাখি?
থুরথুরে অন্ধ পেঁচা এসে
বলেনি কি: 'বুড়ি চাঁদ গেছে বুঝি বেনোজলে ভেসে
চমৎকার!
ধরা যাক্ দু-একটা ইঁদুর এবার!'
জানায়নি পেঁচা এসে এ তুমুল গাঢ় সমাচার?

জীবনের এই স্বাদ—সুপক্ব যবের ঘ্রাণ হেমন্তের বিকেলের—
তোমার অসহ্য বোধ হ'লো;

মর্গে কি হৃদয় জুড়োলো
মর্গে—গুমোটে
থ্যাঁতা ইঁদুরের মতো রক্তমাখা ঠোঁটে।

শোনো
তবু এ মৃতের গল্প; কোনো
নারীর প্রণয়ে ব্যর্থ হয় নাই;
বিবাহিত জীবনের সাধ
কোথাও রাখেনি কোনো খাদ,
সময়ের উদ্বর্তনে উঠে এসে বধূ
মধু—আর মননের মধু
দিয়েছে জানিতে;
হাড়হাভাতের গ্লানি বেদনার শীতে
এ-জীবন কোনোদিন কেঁপে ওঠে নাই;
তাই
লাসকাটা ঘরে
চিৎ হ'য়ে শুয়ে আছে টেবিলের 'পরে।

জানি—তবু জানি
নারীর হৃদয়—প্রেম—শিশু—গৃহ—নয় সবখানি;
অর্থ নয়, কীর্তি নয়, সচ্ছলতা নয়—
আরো-এক বিপন্ন বিস্ময়
আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে
খেলা করে;
আমাদের ক্লান্ত করে
ক্লান্ত—ক্লান্ত করে;
লাসকাটা ঘরে
সেই ক্লান্তি নাই;
তাই
লাসকাটা ঘরে
চিৎ হ'য়ে শুয়ে আছে টেবিলের 'পরে।

তবু রোজ রাতে আমি চেয়ে দেখি, আহা,
থুরথুরে অন্ধ পেঁচা অশ্বত্থের ডালে ব'সে এসে
চোখ পাল্টায়ে কয়: 'বুড়ি চাঁদ গেছে বুঝি বেনোজলে ভেসে?
চমৎকার !
ধরা যাক্ দু-একটা ইঁদুর এবার—'

হে প্রগাঢ় পিতামহী, আজো চমৎকার ?
আমিও তোমার মতো বুড়ো হবো—বুড়ি চাঁদটারে আমি ক'রে দেবো
কালীদহে বেনোজলে পার;
আমরা দুজনে মিলে শূন্য ক'রে চ'লে যাবো জীবনের প্রচুর ভাঁড়ার।

রাত্রি

হাইড্র্যান্ট খুলে দিয়ে কুষ্ঠরোগী চেটে নেয় জল;
অথবা সে-হাইড্র্যান্ট হয়তো বা গিয়েছিলো ফেঁসে।
এখন দুপুর রাত নগরীতে দল বেঁধে নামে।
একটি মোটরকার গাড়লের মতো গেল কেশে

অস্থির পেট্রল ঝেড়ে; সতত সতর্ক থেকে তবু
কেউ যেন ভয়াবহভাবে প'ড়ে গেছে জলে।
তিনটি রিক্‌শ ছুটে মিশে গেল শেষ গ্যাসল্যাম্পে
মায়াবীর মতো জাদুবলে।

আমিও ফিয়ার লেন ছেড়ে দিয়ে—হঠকারিতায়
মাইল-মাইল পথ হেঁটে—দেয়ালের পাশে
দাঁড়ালাম বেন্টিঙ্ক স্ট্রীটে গিয়ে—টেরিটিবাজারে;
চীনেবাদামের মতো বিশুষ্ক বাতাসে।

মদির আলোর তাপ চুমো খায় গালে।
কেরোসিন কাঠ, গালা, গুনচট, চামড়ার ঘ্রাণ
ডাইনামোর গুঞ্জনের সাথে মিশে গিয়ে
ধনুকের ছিলা রাখে টান।

টান রাখে মৃত ও জাগ্রত পৃথিবীকে।
টান রাখে জীবনের ধনুকের ছিলা।
শ্লোক আওড়ায়ে গেছে মৈত্রেয়ী কবে;
রাজ্য জয় ক'রে গেছে অমর আত্তিলা।

নিতান্ত নিজের সুরে তবুও তো উপরের জানালার থেকে
গান গায় আধো জেগে ইহুদী রমণী;
পিতৃলোক হেসে ভাবে, কাকে বলে গান—
আর কাকে সোনা, তেল, কাগজের খনি।

ফিরিঙ্গি যুবক ক'টি চ'লে যায় ছিমছাম।
থামে ঠেস দিয়ে এক লোল নিগ্রো হাসে;
হাতের ব্রায়ার পাইপ পরিষ্কার ক'রে
বুড়ো এক গরিলার মতন বিশ্বাসে।

নগরীর মহৎ রাত্রিকে তার মনে হয়
লিবিয়ার জঙ্গলের মতো
তবুও জন্তুগুলো আনুপূর্ব—অতিবৈতনিক,
বস্তুত কাপড় পরে লজ্জাবশত।

তিমিরহননের গান

কোনো হ্রদে
কোথাও নদীর ঢেউয়ে
কোনো এক সমুদ্রের জলে
পরস্পরের সাথে দু-দণ্ড জলের মতো মিশে
সেই এক ভোরবেলা শতাব্দীর সূর্যের নিকটে
আমাদের জীবনের আলোড়ন—
হয়তো বা জীবনকে শিখে নিতে চেয়েছিলো।
অন্য এক আকাশের মতো চোখ নিয়ে
আমরা হেসেছি,
আমরা খেলেছি;
স্মরণীয় উত্তরাধিকারে কোনো গ্লানি নেই ভেবে
একদিন ভালোবেসে গেছি।
সেই সব রীতি আজ মৃতের চোখের মতো তবু—
তারার আলোর দিকে চেয়ে নিরালোক।
হেমন্তের প্রান্তরের তারার আলোক।
সেই জের টেনে আজো খেলি।
সূর্যালোক নেই—তবু—
সূর্যালোক মনোরম মনে হ'লে হাসি।
স্বতই বিমর্ষ হ'য়ে ভদ্র সাধারণ
চেয়ে দ্যাখে তবু সেই বিষাদের চেয়ে
আরো বেশি কালো-কালো ছায়া
লঙ্গরখানার অন্ন খেয়ে
মধ্যবিত্ত মানুষের বেদনার নিরাশার হিসেব ডিঙিয়ে
নর্দমার থেকে শূন্য ওভারব্রিজে উঠে
নর্দমায় নেমে—
ফুটপাত থেকে দূর নিরুত্তর ফুটপাতে গিয়ে
নক্ষত্রের জ্যোৎস্নায় ঘুমাতে বা ম'রে যেতে জানে।
এরা সব এই পথে;
ওরা সব ওই পথে—তবু

মধ্যবিত্তমদির জগতে
আমরা বেদনাহীন—অন্তহীন বেদনার পথে।
কিছু নেই—তবু এই জের টেনে খেলি;
সূর্যালোক প্রজ্ঞাময় মনে হ'লে হাসি;
জীবিত বা মৃত রমণীর মতো ভেবে—অন্ধকারে—
মহানগরীর মৃগনাভি ভালোবাসি।

তিমিরহননে তবু অগ্রসর হ'য়ে
আমরা কি তিমিরবিলাসী?
আমরা তো তিমিরবিনাশী
হ'তে চাই।
আমরা তো তিমিরবিনাশী।

অদ্ভুত আঁধার এক

অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ-পৃথিবীতে আজ,
যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দ্যাখে তা'রা;
যাদের হৃদয়ে কোনো প্রেম নেই—প্রীতি নেই—করুণার আলোড়ন নেই
পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া।
যাদের গভীর আস্থা আছে আজো মানুষের প্রতি
এখনো যাদের কাছে স্বাভাবিক ব'লে মনে হয়
মহৎ সত্য বা রীতি, কিংবা শিল্প অথবা সাধনা
শকুন ও শেয়ালের খাদ্য আজ তাদের হৃদয়।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত
(১৯০১)

যযাতি

উত্তীর্ণ পঞ্চাশ: বনবাস প্রাচ্য প্রাজ্ঞদের মতে
অতঃপর অনিবারণীয়; এবং বিজ্ঞানবলে
পশ্চিম যদিও আয়ুর সামান্য সীমা বাড়িয়েছে
ইদানীং, তবু সেখানেই মৃত্যুভয় যৌবনের
প্রভু, বার্ধক্যের আত্মাপহারক। আশ্রুত তারক
অন্যত্রও অনাগত; জাতিভেদে বিবিক্ত মানুষ;
নিরঙ্কুশ একমাত্র একনায়কেরা। কিন্তু তারা
প্রাচীর, পরিখা, রক্ষী, গুপ্তচর ঘেরা প্রাসাদেও
উন্নিদ্র যেহেতু, তাই ভগ্ন সেতু নদীতে নদীতে,
মরু নগরে নগরে। পক্ষান্তরে অতিবেল কারা
তথা সংক্রমিত মেরু ব্যক্তির ধ্বংসাবশেষে: দ্বেষে
পুষ্ট চীন থেকে পেরু; প্রতিহিংসা মানে না সিন্ধুর
মানা। নৈশ হানা, আত্মঘাতী অঙ্গীকার, বিচারের
সম্মত বিকার বা স্বস্থ ধিক্কার এড়িয়ে যে যায়
ভাগ্যগুণে, চোখে চোখে রাখে তাকে অদৃশ্য শকুনে
প্রবাসেও অহরহ: যথাকালে অমৃতের দায়
সাশ্রু সন্ততিকে সঁপে, অন্তিম শয্যায় নিকামত
পারে না আশ্রয় নিতে; উষর ধূলিতে নিষ্পিষ্ট সে,
ইতিহাসনিষ্ক্রান্তও বটে। অর্থাৎ কৃতান্ত আজ
ব্যক্ত সর্ব ঘটে; এবং, প্রৌঢ়ের কেন, সকলেরই
কর্তব্য যেমন অরণ্যে রোদন, তেমনই সম্প্রতি
সাধ্য লোকালয়ে সে-বৃথা বিলাপ॥

অবশ্য আমার
পক্ষে সংগত যে নয় অনুতাপ, সে-কথা স্বীকার
করি; কারণ যদিচ মগ্ন শৈলে আমার মাতাল
নৌকা বানচাল হয়ে, বর্তমানে বিশ্লিষ্ট কঙ্কাল—
অপ্রাপ্তসংকার শব প'চে প'চে অস্থিসার যেন—
তথাপি যেকালে নিরুদ্দেশ যাত্রার সংজ্ঞায় হেন
দুরবস্থা শুধু সম্ভাব্যই নয়, অবশ্যম্ভাবীও
বটে, অশোভন তখন নির্বেদ। তাছাড়া স্বকীয়
সিদ্ধি প্রার্থনীয় নয় সূত্রধার গণেশের কাছে;
অকূল পাথারে অযাচিত সাম্রাজ্য একদা বাচে
যারা জিতেছিল, অন্তত তাদের অনন্য সম্বল
ছিল প্রাণপাত পৌরুষ এবং রুদ্র কৌতূহল—
নিতান্ত নিরুপলক্ষ। তরল অনলে পরিণত
ঝলমল জল; গলিত অম্বরতল; অনুগত
দিগ্বধূর আঁখি ছলছল কষ্টকল্পনায়; মেঘে
অন্তর্হিত চূড়া, পদান্ত ঊর্মির মুখর উদ্বেগে
প্রতিষ্ঠিত অস্তগিরি, ইত্যাদি বিবাদী লক্ষণের
অলৌকিক নির্বিরোধ তথা সে-সমন্বয়ের জের
স্মিত বিদেশিনীর অভয়ে, এবং সোনার তরী
তাদের ডাকেনি অজানার অভিসারে। হিংস্র অরি
বন্দরে বন্দরে, অবিশ্বাস্য অনুচর, অবহেলা
চরমে নিশ্চিত জেনেই, বেরিয়েছিল তারা॥

ভেলা

আমি ভাসিয়েছিলুম একদা তাদেরই মতো, আজ
এটুকুই আমার পরম পরিচয়। আমাকেও
লক্ষ্যভেদী নিষাদের উল্বণ উল্লাস উদাসীন
নদীর উজানে দিয়েছিল অব্যাহতি মাল্লাদের
গুণটানা থেকে। গাঁঠ গাঁঠ বিলাতী বস্ত্রের ভার,
রাশি রাশি মার্কিনী গমের ভাবনা ও প্রতিযোগী
ব্যাপারীর বাদ-বিসংবাদ সঙ্গে সঙ্গে গিয়েছিল

ঢুকে; এবং হঠাৎ অধোগতি অনুকূল স্রোতে
হয়েছিল অবারিত। অন্তরীক্ষ বিদীর্ণ বিদ্যুতে;
ভ্রমি; ভঙ্গ; জলস্তম্ভ; সমুখ প্রত্যুষ কপোতের
পক্ষবিধূনন; সন্নত সবিতা বেগুনী শোণিতে
লুপ্ত রহস্যের বীভৎস প্রতীক; ফুটন্ত জলার
জালে জর্জরিত তিমি; শেষনাগ শিথিলকুণ্ডলী,
মৎকুণের উপজীব্য; অপ্রমেয় নির্বাতমণ্ডলে
বিধ্বস্ত সলিল; উর্ধ্বশ্বাস বরুণের বিপরীত
রতি—সবই দেখেছিলুম আমিও, না দেখে দেখেছি
ব'লে ভাবিনি অথবা অস্বীকার করিনি দেখার
পরে; এবং এখন স্বভাবের অনুমোদনেই
আমার অনন্য স্বপ্ন প্রাচীন প্রাকারে সুরক্ষিত
জনপদ, স্নিগ্ধ, সান্দ্র সন্ধ্যায় যেখানে খিন্ন শিশু
ভঙ্গুর তরণী-সহ মুকুরিত নিকষ গোষ্পদে॥

কিন্তু গত শতকেও উল্লিখিত গ্রামের সন্ধান
পায়নি স্বয়ং র‍্যাঁবো, সার্বজন্য রসের নিপান
মৃগতৃষ্ণানিবারণে অসমর্থ ব'লে, সে যদিও
ছুটেছিল জনশূন্য পূর্ব আফ্রিকায়, পরকীয়
সাম্রাজ্যবাদের প্রায়শ্চিত্তকল্পে যেন (সাকী আর
কবিতা সেখানে যেমন অভাবনীয়, মদিরার
অপর্যাপ্তি তেমনই দারুণ)। আমি বিংশ শতাব্দীর
সমানবয়সী; মজ্জমান বঙ্গোপসাগরে; বীর
নই, তবু জন্মাবধি যুদ্ধে যুদ্ধে, বিপ্লবে বিপ্লবে
বিনষ্টির চক্রবৃদ্ধি দেখে, মনুষ্যধর্মের স্তবে
নিরুত্তর, অভিব্যক্তিবাদে অবিশ্বাসী, প্রগতিতে
যত না পশ্চাৎপদ, ততোধিক বিমুখ অতীতে।
কারণ ভূতের নির্বন্ধাতিশয্যে, তথা ভবিষ্যের
নিষেধে, অধুনা ত্রিশঙ্কু এবং সে-খণ্ড বিশ্বের
মধ্যে দ্বৈপায়ন আমরা সকলে, জানি কি না জানি,
নাস্তিরই বিবর্তবাদ। এমনকি উপস্থিত হানি

সম্ভবত অবাস্তব সুললিত সে-পদ্যের মতো,
যাতে রেণু, বেণু, কদাচ ধেনুও, মিলে, ক্রমাগত
অভিভাবে আত্মোপলব্ধির অভাব লুকিয়ে রাখে;
এবং অলীক ভেবে, উচ্ছ্বসিত স্বপ্নরচনাকে
যখন করেছি ত্যাগ, সেকালে স্বকপোলকল্পিত
সর্বনাশে হাহুতাশ অবৈধ ও সাফল্যবর্জিত॥

উপরন্তু, দেবযানী-শর্মিষ্ঠার কলহকলাপে
আমার অদ্বৈতসিদ্ধি পণ্ড হয়ে থাক বা না থাক,
অকাল জরায় আমি অবরুদ্ধ নই শুক্রশাপে;
অজাত পুরুষ সঙ্গে ব্যতিহার্য নয় দুর্বিপাক।
অর্থাৎ প্রকট ব'লে সম্ভোগের অনন্ত বঞ্চনা,
পঞ্চাশে পা না দিতেই, অন্তর্যামী নৈমিষে নির্বাক:
এবং রটায় বটে মাঝে মাঝে আজও উদ্ভাবনা
পরিপূর্ণ মহাশূন্য ভস্মীভূত জ্যোতিষ্কের প্রেতে,
প্রাক্তন অভ্যাসদোষে ভুলে যায় মৌনের মন্ত্রণা
উন্নীত অমর কাব্যে কাগজের সুকুমার শ্বেতে;
কিন্তু চিত্তবিক্ষেপেও অভিব্যাপ্ত বর্তুল সংসার
যেখানে আসক্তি, ঘৃণা ভিন্ন শুধু প্রাগ্বর্তী সংকেতে,
এবং চক্রান্তভুক্ত পূর্বাপর নিপাত, উদ্ধার
যেহেতু, আমাকে তাই অনুযোগ, শোচনা, ঈর্ষাদি
ক্ষেপাতে পারে না আর। চরাচরে নেতির বিস্তার
নির্বিকার, হয়তো বা নিরাকার ব্রহ্মের সমাধি :
অন্তত এ-পরিবেশে মানুষের প্রার্থনাসমূহ
জাতিস্মর অভিমন্যু; তবু স্তব্ধ বিধাতাকে সাধি—
মেনে নিতে পারি যেন অপ্রতর অসীমের ব্যূহ,
স্বপ্নে, জাগরণে যেন মনে রাখি নয় কল্পতরু
ঊর্ধ্বমূল, অধঃশাখ, দুনিরীক্ষ্য সেই মহীরুহ,
যাকে কেন্দ্র ক'রে ছোটে দিগ্বিদিকে সমুদ্র—না মরু?

১৮ মার্চ, ১৯৫৩

কঞ্চুকী

নাটকী নায়ক-রূপে আজীবন দেখেছি নিজেকে;
ভেবেছি আমার সঙ্গে অদৃষ্টের দ্বৈরথসমর:
মর্ত্যের প্রতিভূ আমি, প্রতিপক্ষ সন্ত্রস্ত অমর,
কাজেই নিস্তার নেই পরিণামী সর্বনাশ থেকে;

তবু যবনিকাপাত দেবে ম্লান পরাজয় ঢেকে;
প্রতিলোম অভিযানে লোকযাত্রা হবে অগ্রসর,
আমাকে হৃৎপদ্মে ধ'রে; ব্যর্থ বীর্যে যীশুর দোসর,
আমি যাব আত্মৌপম্য সমাহিত সন্ততিতে রেখে॥

উপস্থিত পঞ্চমাঙ্ক: প্রাক্‌নির্বাণ দীপের উদ্ভাসে
সমবেত পাত্র-পাত্রী করে স্ব স্ব বিধিলিপি পাঠ;
নেপথ্যে আমার স্থান; অন্ধকারে অধিকারী হাসে;
সে রঙ্গরসিক ব'লে, আমি ভ্রান্তিবিলাসে সম্রাট্‌॥

কদাচ দৈবাৎ যদি বাস্তবিক ভূমিকায়ও ঢুকি,
কামাখ্যার ষড়যন্ত্রে সাজি তবে ঘুমন্ত কঞ্চুকী॥

২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৪১

সোহংবাদ

নিখিল নাস্তির মৌনে সোহংবাদ করেছি ধ্বনিত:
বলেছি আমি সে-আত্মা, যে উত্তীর্ণ দূরান্ত তারায়
উধাও মনের আগে; মাতরিশ্বা নিয়ত ধারায়
ফলায় যে-কর্মফল, তা আমারই বুভুক্ষাজনিত;

যেহেতু প্রশ্রয়ী আমি, তাই আজও নয় অপনীত
হিরণ্ময় পাত্র, তথা দুর্নিরীক্ষ্য পুষার কারায়

স্বরাট্ স্বরূপ লুপ্ত; দেশ-কাল আমাতে হারায়
অথচ অম্বিষ্ট তীর্থে, পলে পলে আমি অগণিত॥

অতিক্রান্ত সন্ধিলগ্ন: শূন্য দৃষ্টি স্বতই স্বগত;
অসহায় অন্ধকারে কিন্তু কোথা আত্মপরিচয়?
গচ্ছিত জাড্যের ভারে অনিকাম জঙ্গম জগৎও;
জঘন্য চক্রান্তে লিপ্ত অতীন্দ্রিয় ভাবনানিচয়॥

ক্ষেত্রনিরপেক্ষ প্রমা প্রতিকারী প্রমাদের গুণে;
সংক্ষিপ্ত চেষ্টাই রটে অপৌরুষ বিবর্তের দুনে॥

২৬ এপ্রিল, ১৯৪৫

কাস্তে

আকাশে উঠেছে কাস্তের মতো চাঁদ,
এ-যুগের চাঁদ কাস্তে।
ছায়াপথে কোন্ অশরীরী উন্মাদ
লুকাল আসতে আসতে?
স্ফীত ধমনীতে ঘোরে অনামিকা শঙ্কা;
হৃদয়ারণ্যে বাজে বর্বর ডঙ্কা;
ছাই হয়ে গেছে প্রতীকী স্বর্ণলঙ্কা
নির্বাণ সূর্যাস্তে।
হঠাৎ হাওয়ায় হাতুড়ির প্রতিবাদ:
এ-যুগের চাঁদ কাস্তে॥

আকাশে উঠেছে কাস্তের মতো চাঁদ,
এ-যুগের চাঁদ কাস্তে।
বিপ্রলব্ধ প্রেতের আর্তনাদ
মানা করে ভালোবাসতে।
সংগমে মিছে খুঁজে মরি নিরাপত্তা;

ক্রমায়াত ঋণে ন্যস্ত আমার সত্তা;
আসে সে-বেতাল, তুমি যার বাগ্‌দত্তা,
দন্তিল হাসি হাসতে।
চৈতী ফসলে শটিত শবের স্বাদঃ
এ-যুগের চাঁদ কাস্তে।।

আকাশে উঠেছে কাস্তের মতো চাঁদ,
এ-যুগের চাঁদ কাস্তে।
নিষ্প্রতিকার ধৈর্যের পাকা বাঁধ
বাধা দেয় বানে ভাসতে।
আমদের জ্ঞান আপ্তবাণীর ভাষ্যে;
শান্তি জীবন্মৃত্যুর ঔদাস্যে;
স্বার্থসিদ্ধি সাক্ষীর স্মিত আস্যে
উঞ্ছ ঠাসতে ঠাসতে।
বিকল প্রেমিক আমাদের প্রভুপাদঃ
এ-যুগের চাঁদ কাস্তে।।

আকাশে উঠেছে কাস্তের মতো চাঁদ,
এ-যুগের চাঁদ কাস্তে।
কল্পান্তের অনিকাম অবসাদ
ব্যাপ্ত স্বাস্থ্যাস্বাস্থ্যে।
শুষ্ক ক্ষীরোদসাগরে মগ্ন বিষ্ণু;
নরপিশাচেরা পৃথিবীতে আজ জিষ্ণু;
চিনেও চেনে না স্বাবলম্বী অসহিষ্ণু
সমবায়ী অপরান্তে।
খণ্ডাবে কবে অমৃতের অপরাধ
কালপুরুষের কাস্তে?

১১ মে, ১৯৩৯

অমিয় চক্রবর্তী
(১৯০১)

সংগতি

মেলাবেন তিনি ঝোড়ো হাওয়া আর
পোড়ো বাড়িটার
ঐ ভাঙা দরজাটা।
মেলাবেন।

পাগল ঝাপটে দেবে না গায়েতে কাঁটা।
আকালে আগুনে তৃষ্ণায় মাঠ ফাটা
মারী-কুকুরের জিভ দিয়ে খেত চাটা,—
বন্যার জল, তবু ঝরে জল,
প্রলয় কাঁদনে ভাসে ধরাতল—
মেলাবেন।

তোমার আমার নানা সংগ্রাম,
দেশের দশের সাধনা, সুনাম,
ক্ষুধা ও ক্ষুধার যত পরিণাম
মেলাবেন
জীবন, জীবন-মোহ,
ভাষাহারা বুকে স্বপ্নের বিদ্রোহ—
মেলাবেন, তিনি মেলাবেন।

দুপুর ছায়ায় ঢাকা,
সঙ্গীহারানো পাখি উড়ায়েছে পাখা,

পাখায় কেন যে নানা রঙ তার আঁকা।
প্রাণ নেই, তবু জীবনেতে বেঁচে থাকা
—মেলাবেন।
তোমার সৃষ্টি, আমার সৃষ্টি, তাঁর সৃষ্টির মাঝে
যত কিছু সুর, যা-কিছু বেসুর বাজে
মেলাবেন।

মোটর গাড়ির চাকায় ওড়ায় ধুলো,
যারা সরে যায় তারা শুধু—লোকগুলো;
কঠিন, কাতর, উদ্ধত, অসহায়,
যারা পায়, যারা সবই থেকে নাহি পায়,
কেন কিছু আছে বোঝানো, বোঝা না যায়—
মেলাবেন।

দেবতা তবুও ধরেছে মিলন ঝাঁটা,
স্পর্শ বাঁচায়ে পুণ্যের পথে হাঁটা,
সমাজধর্মে আছি বর্মেতে আঁটা,
ঝোড়ো হাওয়া আর ঐ পোড়ো দরজাটা
মেলাবেন, তিনি মেলাবেন॥

মাটি

ধান করো, ধান হবে, ধুলোর সংসারে এই মাটি
তাতে যে যেমন ইচ্ছে খাটি।
বসে যদি থাকো তবু আগাছায় ধরে বিন্দু ফুল
হলদে-নীল তারি মধ্যে, রুক্ষ মাটি তবু নয় ভুল—
ভুল থেকে সরে সরে অন্য কোনো নিয়মের চলা,
কিছু না-কিছুর খেলা, থেমে নেই হওয়ার শৃঙ্খলা,
সৃষ্টি মাটি এইমতো।
তাইতো আরোই বেশি ভাবি
ফলাবো না কেন তবে আশ্চর্যের জীবনীর দাবি।

কচি বৃন্তে গুচ্ছ অন্নধান
সোনামাঠে ছেয়ে দেবে শ্রমের সম্মান।
তারি জন্যে সূর্য তাপী, বাহুর শক্তির অধিকার,
মানুষের জন্ম নিয়ে প্রাণের সংকল্প বাঁচাবার।
বৃষ্টি ঝরে, চৈতন্যের বোধে
আবার আকাশ ভরে রোদে।
তারি জন্যে শিশু অঙিনায়
দৌড়ে খেলে, হাট বসে, গৌরীপুরে জমে ব্যবসায়।
গাছ চাই, গাছ হবে, ছায়া দেবে, বাড়িতে বাগানে
শহরে শিল্পের সৌধে প্রাণ জাগে প্রাণে।
যা হয় তারই সে হওয়া আরোই উজ্জ্বল করে তুলি
কঠিন লাবণ্যে ছুঁই মনের অঙ্গুলি।
বীজ আনি, জল আনি, ভাগ্যজয়ী খেলা তারো বেশি—
যে-রহস্য সর্বাতীত তারি সঙ্গে হোক রেশারেশি
অচিন্ত্য বিস্ময় খুলে যাই—
কিছু হয়, হয় না বা, এরি মাটি চষি এসো ভাই॥

হারানো অর্কিড

রাত-জাগা ব্যবসায়; উচ্চে হেনে তীক্ষ্ণ স্বপ্নচোখ
দ্রুতের জ্যোতির ঝাঁক চিহ্ন-অঙ্কে ঘিরে ধরতে চায়,
ফরাসী যুবক আঁদ্রে,—গুচ্ছ তারা হীরে শূন্যে—একা
ফেলে যায় প্যারিসের নকশা গলি, গ্যাসপোস্ট, ক্রমে
সমস্ত ফ্রান্সের ব্যাপ্তি, য়ুরোপ, শেষ চক্ষে তার
ভূলুণ্ঠিত এই ছায়া ধরণীর, চেনার উড়ুনি
অন্তর্হিত বিন্দু কাঁচে—সীন্ নদী কুয়াশা-দুপুরে
যেমন তলিয়ে থাকে প্রাণজাল ছিন্ন বিঘ্নহীন
প্রগাঢ় অদৃশ্যে হারা;
গণনার মর্মের সিঁড়িতে
শব্দ ক'রে কে হঠাৎ দূরবীন-ছাতের চাতালে

সোজা উঠে এসে বলে, "আঁদ্রে, আজো স্বচ্ছতার নেশা
ভাঙল না ভাঙা চাঁদে? সত্যি বলো কী এনেছ?" খুলে
সুতো-জরি দেয় তাকে রুপোলি ইঁদুর, মস্ত লেজ
—হাসির লহরে মাপা লেজের বহর—রেনে
ঈষৎ আর্তির স্বরে মিশ্রিত কৌতুক ঢেলে বলে
"আর না, আজকের মতো শেষ ক'রে নামো, একটু শোবে
ডর্মিটরি-ঘরে গিয়ে, রাত্রের দেয়ালে তুলি টানে
রাঙা শুকনো ভোর ঐ ফ্যাকাশে নির্ঘুম ঘণ্টা বাজা,
জানো না কি?"
রেনে একলা আপন বাড়িতে চ'লে যায়।।
পর হপ্তা লাইব্রেরিতে চশমা-আঁটা আঁদ্রে প্রায় যেই
স্তূপ-বই কেন্দ্রে ঢুকে তন্মাত্র দশায় সন্ধ্যাবেলা
জটিল অস্তিত্ব ভোলে, খাওয়া ভোলে, সহপাঠী রেনে
সামনে এসে দাঁড়িয়েই ফিসফিস অনর্গল বলে
"টেলিফোনে দুটো জায়গা কাছেই মো-মার্তে রেখেছি
সামান্য স্যালাড আর অলিভ, যেমন খেতে চাও
ধারের টেবিলে সেই, দু-ফোঁটা সিন্‌জানো, শ্রিম্প্‌-কারি,
দেমি-তাস কফি দু-জনের? ইচ্ছে হলে আইসক্রীম
—কিংবা প্রিয় চীজ্‌ সেই, পাৎলা বিস্কুটে ভালোবাসো—
মস্ত ভোজ নয়, তবু যথেষ্ট ফরাসী আমাদেরি।"
আঁদ্রের হারানো মন সেদিন কী হল আলো-তটে
সংসার ঘরের যেন প্রথম জানানি, চুল ওড়া
দু-জনায় হেঁটে যায় বুলভার্ড্‌ পেরিয়ে পার্কের
যেখানে বেলুন-বিক্রি, শুধু তাই নয় , যেতে পথে
ফুলের দোকানে আঁদ্রে সবুজ অর্কিড কিনে ফেলে
লজ্জিত প্রসন্ন লোভে, পরে মোমবাতির আলোয়
রেনেকে পরায় ঐ উপহার ফুল, পিনে এঁটে,
রেস্তরাঁয়—আঙুল চুম্বন ক'রে, নম্র মাথা,—রেনে
সেদিন মর্তের ঘরে মানবীর স্বর্গ-অধিকার
স্নিগ্ধ লঘু বয়সের প্রান্তে ধরে, বন্ধ বেশি কথা
রাত্রির আলোয় ফেরে, হঠাৎ ব্যাকুল রেনে বলে

"অর্কিড গিয়েছে পড়ে, চলো ফিরি,"—আঁদ্রে সুনিশ্চয়
দেয় তাকে, "জেনো সে কখনো হারাবে না, ও-রাস্তায়
খোঁজা বৃথা," তবুও রেনের চোখ ছলছল বুক
মানে কি সান্ত্বনা, শেষে করুগেট কালো দরজার
পৌঁছনো বাড়িতে তারা শুভরাত্রি যাচে পরস্পর
খুশির দু-চোখ আর্দ্র, হাত ধ'রে ফিরে চুপিচুপি
রেনের একটু কথা—"অর্কিড কখনো হারাবে না।।"

বাসা-বদল

পেয়ালা ও প্লেট:
রাত্রে এসে রান্নাঘরে দাঁড়াই কোথায়, সাক্ষী ওরা
সাক্ষী আমি, মাথা হেঁট—
নিঃশব্দ পসরা
ফিকে সবজি। চেনা চায়না। কতদিন চেনা
চায়ের আসরে কবে হঠাৎ উৎসবে
কারু পাত্রে ভরেছিল আনন্দ প্রহর
আলোর জহর—
নিভৃত সংসারে সে কি বুদবুদের ফেনা
ভাসবে নিয়নে-জ্বলা ম্লান সন্ধ্যাস্রোতে
আরব্ধ ভূমিকা শেষ হতে নাই হতে।

নমস্কার।
নম্র গ্যাস-ষ্টোভ; সুইচ্, বিনীত তৎপর বিজলি-ধার;
দেয়ালে ঝোলানো সারি কাঁটা-ছুরি; ফ্রিজ্,
হলদে, ঠান্ডা; পাশে জানলা, বস্টন-কেম্ব্রিজ
পরদার আড়ালে চিত্রবৎ।

ছিল কত ধোয়া আর মাজা
সাবানে গরম জলে; চামচে, ডেক্‌চি সাজা—
ওদিকে বসার ঘরে বন্ধুর সংগৎ।
পেয়ালা ও প্লেট
কৃতঘ্ন কালের প্রান্তে ভেঙে যাওয়া সেট্—
ভোর হলে
ট্রাক আসবে, সবই নেবে, আমরাও যাব সঙ্গে চ'লে॥

মণীশ ঘটক
(১৯০২)

কুড়ানি

১

স্ফীত নাসারন্ধ্র, দু'টি ঠোঁট ফোলে রোষে,
নয়নে আগুন ঝলে। তর্জিলা আক্রোশে
অষ্টমবর্ষীয়া গৌরী ঘাড় বাঁকাইয়া
"খাট্টাইশ, বান্দর, তরে করুম না বিয়া।"

এর চেয়ে মর্মান্তিক গুরুদন্ড ভার
সেদিন অতীত ছিল ধ্যান-ধারণার।
কুড়ানি তাহার নাম, দু'চোখ ডাগর
এলোকেশ মুঠে ধরি দিলাম থাপর।

রহিল উদ্‌গত অশ্রু স্থির অচঞ্চল
পড়িল না একফোঁটা। বাজাইয়া মল
যায় চলি। স্বগত, সক্ষোভে কহিলাম
"যা গিয়া! একাই খামু জাম, সব্রি-আম।"

গলিতাশ্রু হাস্যমুখী কহে হাত ধরি,
"তরে বুঝি কই নাই? আমিও বান্দরী।"

২

পঞ্চদশী গৌরী আজ, দিঠিতে তাহার
নেমেছে বিদ্যুৎগর্ভ মেঘের সম্ভার।
অনভ্যস্ত সমুদ্ধত লাবণি প্রকাশে

বিপর্যস্তদেহা তন্বী, অধরোষ্ঠ পাশে
রহস্যে কৌতুকে মেশা হাসির আবীর
সুদূর করেছে তারে, করেছে নিবিড়।
সান্নিধ্য সুদুর্লভ, তবুও সদাই
এ ছুতা ও ছুতা করি বিক্ষোভ মেটাই।
গাছের ডালেতে মাখি কাঁঠালের আঠা
কখনো সখনো ধরি শালিক টিয়াটা।
কুড়ানিরে দিলে করে সোজা প্রত্যাখ্যান—
"আমি কি অহনো আছি কচি পোলাপান!"

অভিমানে ভরে বুক, পারি না ক'সাতে
সেদিনের মত চড়, অথবা শাসাতে॥

৩

ছুটিতে ফিরিলে দেশে কুড়ানি জননী
আশীর্বাদ বরষিয়া ক'ন "শোন মণি,
কুড়ানি উন্নিশে পরে, আর রাহি কত,
হইয়া উঠছে মাইয়া পাহার পর্বত!"
"সুপাত্র দেহম" বলি' দিলাম আশ্বাস
চোরা চোখে মিলিল না দরশ আভাস।

ম্লানমুখ নতশির ফিরি ভাঙা বুকে,
হঠাৎ শুনিনু হাসি। তীক্ষ্ণ সকৌতুকে
কে কহিছে—"মা তোমার বুদ্ধি ত জবর,
নিজের বৌয়ের লাই গা কে বিছরায় বর?"

সহসা থামিয়া গেল সৌর আবর্তন
সহসা সহস্র পক্ষি তুলিল গুঞ্জন
সহসা দখিনা বায়ু শাখা দোলাইয়া
সব ক'টি চাঁপা ফুল দিল ফুটাইয়া॥

১৮।৫।৫৮

আগুন ওদের প্রাণ

কি রদ্দুর কি রদ্দুর আগুনের সমুদ্দর যেন!
চীড় খাওয়া খাঁ খাঁ মাঠ আগুনের হলকায় ধোঁকে
আগুনের ঢেউ লাগে আকাশে বাতাসে মুখে চোখে
তেষ্টায় ফটিকজল ডানা ভেঙে মাটিতে গড়ায়
পাঁকে নাকজাগা মোষ সাধ্যি কার এক পা নড়ায়!
রক্ত ঝরে পলাশের রিক্ত ডালে ঝর ঝর ঝর
আগুন পারে না শুধু শুষে নিতে রক্তের নির্ঝর।
আগুন পারে না নিতে কেড়ে কালো ছেলেটার বাঁশী
আগুন পারে না দিতে মুছে কালো মেয়েটার হাসি
মহুয়া ফুলের গন্ধ মনমাতানো আগুন ছড়ায়
মহুয়া ফুলের মদ শিরে শিরে আগুন ধরায়।
কালো দু'টো ছেলেমেয়ে সাধ করে সে আগুনে পোড়ে
লুটোপুটি খায় হেসে খল খল গলাগলি করে।
আগুন ওদের প্রাণ সে আগুন নেভেনি এখনো॥

১৯৬২

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
(১৯০৩)

পুব-পশ্চিম

তোমার শীতললক্ষ্যা আর আমার ময়ূরাক্ষী
তোমার ভৈরব আর আমার রূপনারায়ণ
তোমার কর্ণফুলি আর আমার শিলাবতী
তোমার পায়রা আর আমার পিয়ালী
এক জল এক ঢেউ এক ধারা
একই শীতল অতল অবগাহন, শুভদায়িনী শান্তি।
তোমার চোখের আকাশের রোদ আমার চোখের উঠোনে এসে পড়ে
আমার ভাবনার বাতাস তোমার ভাবনার বাগানে ফুল ফোটায়।

তোমার নারকেল গুপুরি অশোক শিমুল
আমার তাল খেজুর শাল মহুয়া
এক ছায়া এক মায়া একই মুকুল-মঞ্জরী।
তোমার ভাটিয়াল আমার গম্ভীরা
তোমার সারি-জারি আমার বাউল
এক সুর এক টান একই অকূলের আকুতি।
তোমার টাঙ্গাইল আমার ধনেখালি
তোমার জামদানি আমার বালুচর
এক সুতো এক ছন্দ একই লাবণ্যের টানা-পোড়েন
চলেছে একই রূপনগরের হাতছানিতে।

আমরা এক বৃন্তে দুই ফুল, এক মাঠে দুই ফসল
আমাদের খাঁচার ভিতরে একই অচিন পাখির আনাগোনা।

আমার দেবতার থানে তুমি বটের ঝুরিতে সুতো বাঁধো
আমি তোমার পীরের দরগায় চেরাগ জ্বালি
আমার স্তোত্রপাঠ তোমাকে ডাকে
তোমার আজান আমাকে খুঁজে বেড়ায়।

আমাদের এক সুখ এক কান্না এক পিপাসা
ভূগোলে ইতিহাসে আমরা এক
এক মন এক মানুষ এক মাটি এক মমতা।
পরস্পর আমরা পর নই
আমরা পড়শী—আর পড়শীই তো আরশির মুখ
তুমি সুলতানা আমি অপূর্ব
আমি মহবুব তুমি শ্যামলী।

আমাদের শত্রুও সেই এক
যারা আমাদের আস্ত-মস্ত সোনার দেশকে খণ্ড খণ্ড করেছে
যারা আমাদের রাখতে চায় বিচ্ছিন্ন করে বিরূপ করে বিমুখ করে।
কিন্তু নদীর দুর্বার জলকে কে বাঁধবে
কে রুখবে বাতাসের অবাধ স্রোত
কে মুছে দেবে আমাদের মুখের ভাষা আমাদের রক্তের কবিতা
আমাদের হৃদয়ের গভীর গুঞ্জন?
তুমি আমার ভাষা বলো আমি আনন্দকে দেখি
আমি তোমার ভাষা বলি তুমি আশ্চর্যকে দেখ
এই ভাষায় আমাদের আনন্দে-আশ্চর্যে সাক্ষাৎকার।
কার সাধ্য অমৃতদীপিত সূর্য-চন্দ্রকে কেড়ে নেবে আকাশ থেকে?
আমাদের এক রবীন্দ্রনাথ এক নজরুল।
আমরা ভাষায় এক ভালোবাসায় এক মানবতায় এক
বিনা সুতোয় রাখী-বন্ধনের কারিগর
আমরাই একে অন্যের হৃদয়ের অনুবাদ
মর্মের মধুকর, মঙ্গলের দূত
আমরাই চিরন্তন কুশল সাধক॥

বাড়ি

তুমি আমার কাছে একখানা ঘর চেয়েছিলে,
আমি তোমাকে আস্ত একটা বাড়ি এনে দিয়েছিলাম
তোমার আকাঙ্ক্ষার চেয়েও বেশি।

উপরে-নিচে এতগুলি কামরা
ভিতরে-বাইরে এতগুলি বারান্দা
তোমার সে কী আহ্লাদ!
আকাঙ্ক্ষার বেশি হলেও আকাঙ্ক্ষাকে মুহূর্তে বড় করে
বেশির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিলে।
তাকিয়ে দেখলে বাড়ির আওতায়
কোনো ফাঁকা জমি আছে কিনা—
আমাদের সমস্ত সংগ্রামই এই বেশির জন্যে
বাড়তির জন্যে, বাহুল্যের জন্যে।
তখন কি আর জানি অভাব যেমন নষ্ট করে
প্রাচুর্যও তেমনি পথে বসায়!

না, ভাড়াটে বসাতে পারবে না—
বললে মুখ ঘুরিয়ে,
বাড়ির সুমুখটা তাকে ছেড়ে দিয়ে
চোরের মত খিড়কির দরজা দিয়ে নিজের বাড়িতে ঢোকার লজ্জা
বরদাস্ত হবে না।
আর, দেখতে গেলে, আহা, কখানাই বা ঘর!
এরই মধ্যে তুমি পাওয়াটাকে চাওয়ার মাপে কম করে দেখলে
কম করে ফেললে।
দুটো বসবার কুঠুরি—একটা নিচে বাইরে মক্কেলদের জন্যে
উপরেরটা সুহৃত্তম অন্তরঙ্গদের জন্যে।
দুটো স্নানের, দুটো স্টাডি,
একটা সংযুক্ত লাইব্রেরি, একটা সংযুক্ত বেডরুম

কিচেন স্টোর ডাইনিং রুম—এ সব মামুলি তো আছেই,
এটা বাক্স-প্যাঁটরা রাখবার, এটা সাজগোজ সারবার—
জায়গার শেষ আছে জিনিসেরই বুঝি শেষ নেই
কিংবা জিনিসেরই বুঝি শেষ আছে, জায়গাই উত্তাল সমুদ্র।

এখন এখানে ঐশ্বর্য বলতে আতিশয্য
আনন্দ বলতে ফুর্তি
সম্ভোগ বলতে মত্ততা
সাফল্য বলতে আস্ফালন
সংস্কৃতি বলতে বকবৃত্তি
অহংতা বলতে বৈষ্ণবতা—
আর অবসর?
যেমন শ্রমের সম্ভ্রম আছে, তেমনি অবসরের সম্ভ্রম।
মানুষের আসল দাম কী সে কাজ করে তাতে নয়
কী ভাবে অবসর যাপন করে তাতে।
কিন্তু কোথায় অবসর?
শুধু একটা পোষা পশুর সেবা করছি,
সে পশু বাঘ-সিংহের বাচ্চা নয়
নয় কুলীন কুকর-বেড়াল।
সে পশুর নাম অভ্যাস
পুরোনো প্ররোচনা এখন প্রথার খুঁটিতে বাঁধা।
সোনার গাছে চেয়েছিলে হিরের ফুল,
সোনা নিয়েছে ডাকাতে
হিরেগুলি সব অঙ্গার।

বাড়ির মধ্যে থেকে ঘর খুঁজছি
ঘোড়ার পিঠে চড়ে ঘোড়া খোঁজার মত।
মধ্যরাত্রির অনিদ্রা থেকে উঠে এসেছি দুজনে
আমি হাঁটছি এ বারান্দায় তুমি ও-বারান্দায়।

তুমি শুধু একরাত্রির ভালোবাসা চেয়েছিলে
আমি তোমাকে বেশি দিয়ে ফেলেছিলাম,
দিয়ে ফেলেছিলাম আমৃত্যু হাহাকারের মত
একটা গোটা জীবন।
তখন কে জানত বাহুল্যও আমাদের সর্বস্বান্ত করে।।

অন্নদাশঙ্কর রায়
(১৯০৪)

অনুশোচনা

জননি, তোমার শিকল করিতে ভঙ্গ
বিকল করেছি অঙ্গ।
তোমারে যে ব্যথা দিয়েছি তাহার
শত গুণ বহি, বঙ্গ।

পরকে সরাতে ভাইকে করেছি পর
ছেড়েছি আপন ঘর।
দুর্বল ওকে করেছি, হয়েছি
নিজে দুর্বলতর।

জননি, তোমার নিত্য করিব ধ্যান
অভগ্ন-অম্লান।
তুমিই মোদের মেলাবে, আমরা
তোমারি তো সন্তান।

প্রেমেন্দ্র মিত্র

(১৯০৪)

ভৌগোলিক

হিমালয় নাম মাত্র,
আমাদের সমুদ্র কোথায়?
টিমটিম করে শুধু খেলো দুটি বন্দরের বাতি।
সমুদ্রের দুঃসাহসী জাহাজ ভেড়ে না সেথা;
—তাম্রলিপ্তি সকরুণ স্মৃতি।
দিগন্ত-বিস্তৃত স্বপ্ন সমতল উর্বর ক্ষেতের আছে বটে,
কত উগ্র নদী সেই স্বপনেতে গেল মজে হেজে ঃ
এক পদ্মা মরে মাথা কুটে।

উত্তরে উত্তুঙ্গ গিরি
দক্ষিণেতে দুরন্ত সাগর
যে দারুণ দেবতার বর,
মাঠভরা ধান দিয়ে শুধু
গান দিয়ে নিরাপদ খেয়া-তরণীর,
পরিতৃপ্ত জীবনের ধন্যবাদ দিয়ে
তারে কভু তুষ্ট করা যায়!

ছবির মতন গ্রাম
স্বপ্নের মতন শহর
যত পারো গড়ো,
অর্চনার চূড়া তুলে ধরো

তারাদের পানে;
তবু জেনো আরো এক মৃত্যুদীপ্ত মানে
ছিল এই ভূখণ্ডের,
—ছিল সেই সাগরের পাহাড়ের দেবতার মনে।

সেই অর্থ লাঞ্ছিত যে, তাই,
আমাদের সীমা হলো
দক্ষিণে সুন্দরবন
উত্তরে টেরাই!

জোনাকি-মন

এ এক জোনাকি-মন
জ্বলে আর নেভে,
অন্ধকার পার হ'বে ভেবে,
ইতি উতি ধায়;
আলোর ছুঁচের মত
বিঁধে বিঁধে মহা যবনিকা
অনন্তের এক প্রান্তে
ঝিকমিক চেতনার পাড় বুনে যায়।
বিদ্যুতের ব্রত নিয়ে
এতটুকু সীমার আকাশে
ক্ষণে ক্ষণে এও চমকায়।

এ জোনাকি-মন জানি
কোনো দিন পাবে না উত্তর।
চারি দিকে অন্ধ রাত্রি তামসী, দুস্তর,
মৌন নিরন্তর।

তারই মাঝে জিজ্ঞাসার স্ফুলিঙ্গের মত
এ জোনাকি-মন যেন
অকারণে ফোটে আর ঝরে,
মিছে ভাবে, সব থাকা তার-ই
বৃন্ত ধ'রে।

তবু
আঁধারের গূঢ় ধ্বনি
শুধু এ সৃষ্টির
ছপ্ ছপ্ বেয়ে চলা দমকে দমকে!
তারই ছন্দে জ্বলে, নেভে, চমকে চমকে
দপ্ দপ্ কি জোনাকি-মন?
জানা না-জানার চেয়ে চায় কোনো
অন্য উত্তরণ!

মেলা

এখানে বসবে মেলা।
জঙ্গল ও পাহাড়ের আঁকাবাঁকা ওঠানামা পথে,
দূর দূর বসতির খুশি
ঝলমল রঙিন উৎসুক
জড়ো হবে কটি দিন এই শাল-পলাশের বনে।
মাদলে কাঁপবে রাত্রি
ধক্ ধক্ উত্তেজনা পৃথিবীর গভীর বুকের।
মহুয়ার মাদকতা নিয়ে
জ্বলবে মশালে রাঙা ঘোর-লাগা কামনার চোখ।
উর্দ্ধে আর
ধুলোর মেঘেতে মেশা কোলাহল
শূন্য ছেয়ে থাকবে কিছুক্ষণ।

তারপর সব কিছু ফুরোবার পর
সেই নির্জনতা।
পড়ে-থাকা চিহ্ন কিছু
পোড়া কাঠ, উড়ো খড় ছাই,
এখানে-সেখানে ভাঙা কালিমাখা হাঁড়ি-কুড়ি সরা।
ছেঁড়া কাগজের টুকরো আর ঝরা পাতা
এক সঙ্গে নেড়ে-চেড়ে হাওয়ার খেয়াল
বনের মাথায় কঁটা মগডালে বার দুই নেচে
মেঘের কুচিটা দেখে হয়ত হঠাৎ
তার লোভে হবে দূর আকাশে উধাও।

এবার অনেক নীচে
থাকবে শুধু পাহাড়ী নদীর
একটানা মৃদু কুলুকুলু
থেকে-থেকে পাখিদের ডাক দিয়ে গাঁথা।

তখন সেখানে কেউ আসতেও পারে একদিন,
—শিকারী চিতার মত, নয় শুধু শাণিত ব্যগ্রতা,
ভীরু বিহ্বলতা নয় সচকিত শাসকের মত।
হয়ত সে এখানেই
অকারণে বসে' ঘুরে-ফিরে
পেয়ে যাবে আশ্চর্য উত্তর,—
নির্জন স্তব্ধতা খুঁজে
বার বার দু'দিনের দুর্বার আহ্লাদে
না ক'রে হনন,
বেড়া-দেওয়া মাপা মাঠে
কেন পোষ মানে না বসতি।

অজিত দত্ত
(১৯০৭)

পাখি আর তারা

মলিন দিনের থেকে বিবর্ণ সন্ধ্যার ফাঁদ ছিঁড়ে
কোমল নিবিড় স্তব্ধ কোনো এক অন্ধকার নীড়ে
এখন পাখিরা শুধু চলে আর চলে আর চলে,
ধূসর স্মৃতির জীর্ণ জাল ছিঁড়ে যায় দলে দলে।

তবুও এ শহরের শাখায় শাখায় ওরা সারাদিন ছিল,
আমার এ দক্ষিণের জানালার কাছে বুঝি বিভ্রান্ত কোকিলও
একবার দুইবার তিনবার ডাক দিয়ে গেছে।
সোনার রৌদ্রের দিঘি ঘুরে ঘুরে এই ঘাট নিয়েছিল বেছে;
তাদের হয়েছে শেষ বিলাসের ক্ষণ,
আমার জগৎ থেকে ক্লান্ত তারা করে পলায়ন।

আমার হয়নি শেষ, আমার হয়নি শেষ, আমার হয়নি শেষ পাওয়া,
মেটে নাই আকাঙ্ক্ষার সব দাবি-দাওয়া।
আমি আজো ভালবাসি, আজো ভালোবাসি ভালোবাসা,
দুর্নিবার উপভোগ বাসনার অক্ষুণ্ণ পিপাসা
আয়ুর মুহূর্তগুলি গেঁথে রাখে মালার মতন,
নিরন্তর মনে মনে শুনি জীবনের আমন্ত্রণ।

যত হৈম মুহূর্তেরা আসে এই প্রাণের কুটিরে
যাযাবর সেই সব অস্থির চঞ্চল অতিথিরে
কোনোদিন যেতে দিতে হয়।
দিবসের বন্ধু তারা, ম্লান সন্ধ্যা তাহাদের নয়।

এ বিবর্ণ দিন থেকে পলাতক তাই দলে দলে
চঞ্চল পাখিরা শুধু চলে আর চলে আর চলে।
তাদের ডানার ঘায়ে কম্পিত আকাশে
স্থিরজ্যোতি নক্ষত্রের ফোটার সময় হয়ে আসে।

ভোর হল মহেঞ্জোদারোতে

আরেকটি রাত্রি চলে গেল।
ভোর হল মহেঞ্জোদারোতে।

খনিত মাটির স্তর; শতাব্দীর শব-ব্যবচ্ছেদে
গিরীভূত কঙ্কালের মেলে যদি চিহ্ন কোনো কিছু,
তাহারি নিগূঢ় প্রত্নতত্ত্বোচিত সূত্র অন্বেষণে
সারারাত্রি নিদ্রাহীন পণ্ডিতেরা মাথা করি নিচু।
ক্যাম্পে ক্যাম্পে জাগে।
এর পর ভীষণ-দর্শন
মোটা মোটা কেতাবের উজ্জ্বল কভার অন্তরালে
পুরোনো কবর থেকে মহেঞ্জোদারোর নির্বাসন
নতুন কবরে। অবশেষে ডিগ্রি-অর্থী মনোতলে
চরম ও চিরন্তন নিষ্ঠুর সমাধি।

পক্ষপাতহীন কাল!
আরেক হীরকময় শবরীর পরে
ভোর হবে।
আবার ধূসর—কিংবা বর্ণহীন লাইব্রেরির ঘরে
পাণ্ডুর, পণ্ডিতপ্রিয় পুরাতন পুঁথির উপর
অস্পষ্ট অক্ষর।

পুনরায় বিদ্বম্মন্য প্রত্নতাত্ত্বিকের গবেষণা
মৃতকল্প আত্মা আর ঘুমন্ত মনের 'পরে
বুদ্ধি-শল্য-ব্যবচ্ছেদে আবিষ্কারি নব তথ্যকণা
উচ্চ ডিগ্রি লাভ!
হাস্যকর! ও-বিবর্ণ পাণ্ডুলিপি,
ব্যবচ্ছিন্ন ওই আত্মা, এমন-কি কীটভুক্ত আবর্জনা,
সবই যেন চেনা মনে হয় বহু শতাব্দী পরেও,
মনে হয়, কোন্ প্রেসে ছাপা তাও জানি।

বুদ্ধদেব বসু
(১৯০৮)

রবীন্দ্রনাথের প্রতি

তোমারে স্মরণ করি আজ এই দারুণ দুর্দিনে
হে বন্ধু, হে প্রিয়তম। সভ্যতার শ্মশান-শয্যায়
সংক্রমিত মহামারী মানুষের মর্মে ও মজ্জায়;
প্রাণলক্ষ্মী নির্বাসিতা। রক্তপায়ী উদ্ধত সঙিনে
সুন্দরেরে বিদ্ধ ক'রে, মৃত্যুবহ পুষ্পকে উড্ডীন
বর্বর রাক্ষস হাঁকে, 'আমি শ্রেষ্ঠ, সবচেয়ে বড়ো।'
দেশে-দেশে সমুদ্রের তীরে-তীরে কাঁপে থরোথরো
উন্মত্ত জন্তুর মুখে জীবনের সোনার হরিণ।

প্রাণ রুদ্ধ, প্রাণ স্তব্ধ। ভারতের স্নিগ্ধ উপকূলে
লুব্ধতার লালা ঝরে। এত দুঃখ, এ দুঃসহ ঘৃণা—
এ-নরক সহিতে কি পারিতাম, হে বন্ধু, যদি না
লিপ্ত হ'তো রক্তে মোর, বিদ্ধ হ'তো গূঢ় মর্মমূলে
তোমার অক্ষয় মন্ত্র। অন্তরে লভেছি তব বাণী
তাই তো মানি না ভয়, জীবনেরই জয় হবে, জানি।

১৯৪২

ইলিশ

আকাশে আষাঢ় এলো; বাংলাদেশ বর্ষায় বিহ্বল।
মেঘবর্ণ মেঘনার তীরে-তীরে নারিকেলসারি
বৃষ্টিতে ধূমল; পদ্মাপ্রান্তে শতাব্দীর রাজবাড়ি
বিলুপ্তির প্রত্যাশায় দৃশ্যপট-সম অচঞ্চল।

মধ্যরাত্রি; মেঘ-ঘন অন্ধকার; দুরন্ত উচ্ছল
আবর্তে কুটিল নদী; তীর-তীব্র বেগে দেয় পাড়ি
ছোটো নৌকাগুলি; প্রাণপণে ফ্যালে জাল, টানে দড়ি
অর্ধ-নগ্ন যারা, তারা খাদ্যহীন, খাদ্যের সম্বল।

রাত্রিশেষে গোয়ালন্দে অন্ধ কালো মালগাড়ি ভরে
জলের উজ্জ্বল শস্য, রাশি-রাশি ইলিশের শব,
নদীর নিবিড়তম উল্লাসের মৃত্যুর পাহাড়।
তারপর কলকাতার বিবর্ণ সকালে ঘরে-ঘরে
ইলিশ ভাজার গন্ধ; কেরানির গিন্নির ভাঁড়ার
সরস সর্বের ঝাঁজে। এলো বর্ষা, ইলিশ উৎসব।

জুন ১৯৩৮

৩০ জানুয়ারি, ১৯৪৮

অসম্ভব আজীবন শোক করা। স্তম্ভিত পাথর
কান্নার তৃষ্ণায় ভাঙে; পাথরের প্রচ্ছন্ন, অথচ
স্ফীত, তীব্র অসহ্য শিরায় নামে খরস্রোত; হৃদয়ের আরক্ত অধরে
ক্লান্তির করুণা নামে, কান্না থামে। ....তারপর?

পথে-পথে পায়ে-হাঁটা শব্দহীন শোক;
গঙ্গাতীরে নম্র, শান্ত সমতার সূর্যাস্ত-মমতা;
মুদ্রাযন্ত্রে আর্ত রোল; রেডিওতে ধ'রে-আসা গলা...
থেমে যাবে, শেষ হবে, শেষ হ'লো: তারপর?

দুঃখ তার দয়ার সুন্দর হাতে ধ'রে আছে এই
রাত্রির পবিত্র রক্ত; যত ঝরে, তত ধরে হাতে।
কিন্তু রক্ত ঝরে যাবে, কিন্তু এই কান্নার পরেও
আবার অব্যর্থ ভোর ঘরে-ঘরে জাগাবে:—তখন?

জাগাবে আবার জ্বালা, বাঁচার ভীষণ জ্বালা, যার
যন্ত্রণায় ঘরকন্না গুঁড়ো হয়, রাজত্ব ধুলোয় মেশে, কাঁপে মন্ত্রী, গৃহিণী, মজুর;
ক্ষমাহীন এই বাঁচা আবার পাঠাবে প্রশ্ন, যার
উত্তর দিতেই হবে: তখন? ....তখন?

১৯৪৮

রূপান্তর

দিন মোর কর্মের প্রহারে পাংশু,
রাত্রি মোর জ্বলন্ত জাগ্রত স্বপ্নে।
ধাতুর সংঘর্ষে জাগো, হে সুন্দর, শুভ্র অগ্নিশিখা,
বস্তুপুঞ্জ বায়ু হোক, চাঁদ হোক নারী,
মৃত্তিকার ফুল হোক আকাশের তারা।

জাগো, হে পবিত্র পদ্ম, জাগো তুমি প্রাণের মৃণালে,
চিরন্তনে মুক্তি দাও ক্ষণিকার অম্লান ক্ষমায়
ক্ষণিকেরে করো চিরন্তন।

দেহ হোক মন, মন হোক প্রাণ, প্রাণে হোক মৃত্যুর সংগম,
মৃত্যু হোক দেহ, প্রাণ, মন।

বিষ্ণু দে
(১৯০৯)

প্রচ্ছন্ন স্বদেশ

চেয়েছি অনেকদিন
আজো তাকে খুঁজি সারাক্ষণ
কখনো বা পাশ দিয়ে কখনো আড়ালে
কখনো বা দেশান্তরে কখনো বা চোখাচোখি
কখনো বা ডাকে কানে কানে কাছাকাছি
নিঃশ্বাসের তাপে একান্ত আপন ছন্দোময়
বুঝিবা অলক তার কাঁপে আমার কপালে
কখনো হাওয়ায় লাগে হাওয়া

তবু তাকে পাওয়া আজো হ'লো না নিঃশেষ
বাহুর নাগালে নেই অস্পষ্ট অধরা
অথচ সূর্যের মতো সত্য মাটি যেন ফসলের কাছে
পূর্ণিমার চাঁদের মতো প্রত্যক্ষ অথচ
অতনু প্রবাহ তার
রক্তে তার পদধ্বনি জীবনের স্পন্দনে স্পন্দনে
স্বপ্নে তার হৃদয় সদাই শ্রাবণের তালদিঘি
উত্তরাধিকারে তার দীর্ঘ অঙ্গীকার প্রেরণা পৌরুষে

তবু তাকে খুঁজি সারাক্ষণ
খুঁজি সাধারণ্যে তাকে সাধারণে জনতায় চকিতে নিবিড়ে
দুর্গতির ব্যাপ্ত দায়ভাগে নিশ্চিন্ত আশ্বাসে
জনগণের জনসাধারণে দেশের মানুষে
যে যার আপন কাজে রচনায় রচনায়

মনে হয় দেখা বুঝি মেলে
সমুদ্রে সমুদ্রে দেখি আবেগকল্লোলে
এই বুঝি আবির্ভাব
সাগরউত্থিতা উল্লাসে উল্লাসে শপথে শপথে
দীপ্ত মিলিত ভাষায়
লবণাম্বুরাশিরাশিনিবদ্ধধারায় মেলে বনরাজিনীলা
সভায় মিছিলে তোমাদের আমাদের ভিড়ে
সমুদ্র সে সমুদ্রই নয় বুঝি আকস্মিক বান বুঝি
গান শুধু হঠাৎ জোয়ার
উল্লাস উদ্‌ভ্রান্ত মরু ঠেলাঠেলি অন্ধ অহংকার
ক্ষমতার পাতাল সন্ধান প্রায় আত্মঅচেতন

পালায় সে মেঘে-মেঘে বজ্রে ও বিদ্যুতে
মোহানার ভাঁটায় ভাঁটায়
আষাঢ়ের অশ্রুহীন হঠাৎ সন্তাপে
রেখে যায় ছায়া শুধু হাওয়া শুধু রেশ
আকাঙ্ক্ষায় আকাঙ্ক্ষায়

সেই ছায়া দিনরাত খুঁজে ফিরি সেই হাওয়া
রক্তে আঁকি সেই ছদ্মবেশ একান্ত আপন
তালীতমালের বনে মৃত্যুবাঁধা রাজপথে
তোমাদের আমাদের সামনে আড়ালে তাকে
বারবার আজো সারাক্ষণ
অস্পষ্ট আসন্ন তবু যেন বা সে
দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী—

প্রচ্ছন্ন স্বদেশ।।

দামিনী

সেদিন সমুদ্র ফুলে ফুলে হ'ল উন্মুখর মাঘী পূর্ণিমায়
সেদিন দামিনী বুঝি বলেছিল—মিটিল না সাধ।
পুনর্জন্ম চেয়েছিল জীবনের পূর্ণচন্দ্রে মৃত্যুর সীমায়,
প্রেমের সমুদ্রে ফের খুঁজেছিল পূর্ণিমার নীলিমা অগাধ,
সেদিন দামিনী, সমুদ্রের তীরে।

আমার জীবনে তুমি প্রায় বুঝি প্রত্যহই ঝুলন-পূর্ণিমা
মাঘী বা ফাল্গুনী কিংবা বৈশাখী রাস বা কোজাগরী,
এমন কি অমাবস্যা নিরাকার তোমারই প্রতিমা।

আমারও মেটে না সাধ, তোমার সমুদ্রে যেন মরি
বেঁচে মরি দীর্ঘ বহু আন্দোলিত দিবস যামিনী
দামিনী, সমুদ্রে দীপ্র তোমার শরীরে,
তোমার সমুদ্রে আর শরীরের তীরে।।

১১ জানুয়ারি, ১৯৬০

সেই অন্ধকার চাই

ঘন বন, বহুদূর-বিস্তৃত এবং জন্তুতে ভয়াল,
বহু সরীসৃপ, গুপ্ত হত্যার আড়ত, অন্ধকারে তীক্ষ্ণ অন্ধকার,
হিংস্র চিতা নেকড়ে আর হায়েনা, শেয়াল
বিশ্বাসঘাতক বহু জন্তুতে ভয়াল

থেকেছি সে-বনে, নীল আকাশ দেখিনি,
নিঃশ্বাসে টেনেছি ভিজা মাটির মস্তিতে
বাষ্পময় প্রকৃতির অসুস্থ বাতাস
যে-বাতাসে অন্ধকারে স্বভাবত ফুলে ওঠে গোখরো, ময়াল।

থেকেছি বুর্জোয়া বহু দেশে গ্রামে শহরে বস্তিতে,
বহু জন্তু সরীসৃপ কাজ করে, করে বিকিকিনি;
দিবা-দ্বিপ্রহরে ঢাকে কালো ছায়া হৃদয়ে-হৃদয়ে
অন্ধকার দিয়ে ঢাকে লালদিঘির লাল অন্ধকার।

অন্য অন্ধকার আছে? তা-ও চেনা, থেকেছি নিবিড়
ঘন নীল অন্ধকারে, স্পন্দমান ছন্দে অতল স্মৃতির হর্ষে ভয়ে
কাব্যের আদিম গর্ভে যেখানে করেছে মহাভিড়
লক্ষ-লক্ষ জীবন-মৃত্যুর ক্ষিপ্র দিব্য অন্ধকার।

থেকেছি সে-অন্ধকারে, সেই অন্ধকার চাই শরীরে, হৃদয়ে;
সেই বনে হিংস্রতাও স্বাভাবিক, সৃষ্টিময়, মধুর দয়াল;
মৃত্যু নয় দীনহীন, আপতিক, নয় সামাজিক ভয়ে
অথবা হাজার জন্তুর দন্তুর নখী মানবিক শোষণে ভয়াল।।

১১ ডিসেম্বর, ১৯৫৮

পৃথিবীর মানবিক সব অভিলাষ

তবু দেখি দীর্ঘজীবী মানুষের দীর্ঘ ইতিহাস,
যেখানে বন্ধুর অসংলগ্ন মৃত্যুময় পাথরের স্তূপ,
আর কাঁটা-ঝোপ, লতা, সংশয়, সন্ত্রাস
আকাশে মসৃণ আঁকে আগামী নীলিমা
সূর্যোদয়ে, সূর্যাস্তেও আলপনার পদক্ষেপে স্থির অপরূপ,
সেইখানে সহিষ্ণুতা সৃষ্টি করে প্রত্যাশার সীমা।

তবু ক্রুদ্ধ দীর্ঘজীবী সূর্যের হুংকারে দেখি দূর
প্রান্তর, নদীর ছটা, খোদাই সবুজ শালবন।
অগ্নিময় রক্ত, স্নায়ু শূন্য রৌদ্রে মমতার তাপে
কেঁপে-কেঁপে সূর্যকেই ফিরে দেয় আলোর স্পন্দন।

দেখি পাহাড়ের নীলা গ'লে যায় স্ফটিক সন্তাপে
আর স্তব্ধ রুদ্ধ এক প্রতীক্ষায় চেয়ে থাকে অনাথ দুপুর,
কখন গোধূলিলগ্ন রাত্রি পাবে আর অবচেতন বিকাশ
কখন যে স্বচ্ছ হবে, নিদ্রিত নীরব হবে অস্থির নূপুর,
ভোরের বিভাসে পূর্ণ পরিণত শান্ত হবে
পৃথিবীর মানবিক সব অভিলাষ॥

১৮ এপ্রিল, ১৯৬২

সঞ্জয় ভট্টাচার্য
(১৯০৯)

ফুল-বিষয়ক

সূর্যেরও মৃত্তিকা আছে স্থিরতর আরেক আকাশে
যার সে-ই বৈশাখের ফুল।
যেমন এ কৃষ্ণচূড়া সহজ, নির্ভুল
বৈশাখেই আসে।

সূর্য, কোন বৃক্ষে তুমি ফুল?
কোন মাটি সে বৃক্ষে ব্যাকুল?
কোন ব্যাকুলতা নিয়ে মাটি ফুল হয়?

সেই ব্যাকুলতা হও, হে হৃত হৃদয়,
একবার গেয়ে ওঠো পাখির মতন!
শরীরের ক্লান্ত আয়তন
হোক না বারেক কৃষ্ণচূড়া—
জানে না যে কোন কাল-বিন্দু তার রক্তে কামাতুরা!

অরুণ মিত্র
(১৯০৯)

কসাকের ডাক : ১৯৪২

আজভের পিঠের উপরে
চাবুকের শিস শোনো।

দুই হাজার মাইল দূরে
ঝড় উঠে মিলিয়ে গেল সুমেরু-শিখরে
মিলিয়ে গেল তুন্দ্রার তুষার-শিবিরে,
ভাল্‌দাই পাহাড়ে
রক্তের দাগ শুকিয়ে এল বুঝি।
সাঁজোয়া থাবা বাড়িয়ে সেই বুড়ো জানোয়ার
ছিঁড়তে চেয়েছে হৃৎপিণ্ড—
বিশ্বাসঘাতী বাঘনখ প্রতিহত—
মস্কো.....মস্কো!

তারপর অগণিত প্রেতমূর্তি নামে
দক্ষিণে
কালো মাটি চিরে—
১৯১৭-র নভেম্বরের সকাল
বিদ্যুৎগতি অন্ধকারে
জারজের উত্তরাধিকারে আচ্ছন্ন আবার।
এবার কসাকের কড়া পাঞ্জায় চূড়ান্ত মীমাংসা।
মজ্জায় মজ্জায় এ কৃষাণকে চেনো:
ইউক্রাইনের গমের চারায় কুলাকের হাড়ের সার,

আর ধমনীতে ডনের স্রোত।
জনসাধারণ অসাধারণ।

কৃষ্ণসাগরের কাল ফণায় অপূর্ব আক্রোশ—
দুশমন!
আজভের মাথার উপরে ঝাপট,
ডনের রক্তস্রোতে ডাক:
সাথী, কাঁধে কাঁধ মেলাও—
সাদা রুশিয়ার ভাই হো
বড় রুশিয়ার ভাই
সারা দুনিয়ার ভাই হো
এক সাথে দাঁড়াই
দুশমন রুশিয়ার
দুশমন দুনিয়ার
হাতিয়ার দাও ভাই হো
হাতিয়ার।

সমতলের শব্দ পাথরে পাথরে বাজে কঠিন।
উরালে কলকারখানায় ঘর্মম্লান
দীর্ঘ পদক্ষেপে অগ্রসর সাইবেরিয়া অশ্রান্ত,
পামীরে ককেশাসে কঠিন আওয়াজ—
সাথী, কাঁধে কাঁধ মেলাও।

স্টেপ্-এর আদিগন্ত মায়া মরুবালুতে বিলীন।
সার্থবাহপথে কে যায়—কারা?
উটের কঙ্কালের ছায়ায় অস্পষ্ট কবন্ধের পাল।

খিবা বোখারা সমরকন্দ থেকে লোহার গাড়িতে
আসে মানুষ কাতারে কাতার।
ডনের দুই তীরে অশ্বখুর-স্ফুলিঙ্গ,
খোলা তরোয়ালে রক্তের তাল,
আর ডনের মোহানায় ডাক:

গোলামের দল ফাঁস জড়ায়
পুবে পশ্চিমে বিষ ছড়ায়
সাপের শ্বাস
প্রভু আমাদের চায় মরণ
অগ্রদূতের প্রাণহরণ
সর্বনাশ
ভাই হো

জান দিয়ে গড়লাম রুশিয়া
সোভিয়েট রুশিয়া
জান দিয়ে রাখব এ দুনিয়া
রাখবই
ভাই হো
তোমাদের দুনিয়াকে রাখব
রুখবই দুশমন রুখব
দোসরের মুখ চাই ভাই হো.....
হাতিয়ার।

প্রাজ্ঞের মতো নয়

প্রাজ্ঞের মতো নয়, অন্ধের ছুঁয়ে দেখার মতো ক'রে বলো। আমার স্নায়ুতন্ত্র-ধমনী নিয়ে আমি এক অভিন্ন সমতলে আছি। অক্ষরগুলো কাগজে বন্ধ ক'রে এসে তুমি যদি গোধূলিতে নিজেকে আচ্ছন্ন করো এবং অন্তত একটা কুড়োনো পাপড়িও আমার ত্বক মুখের অন্ধকারে রাখো, তাহলে আমি তোমাকে ঠিক শুনতে পাব। মঞ্চে নয়, তার বাইরে মাটিতে দৃষ্টিহীনতার মধ্যে এক প্রখর সৌহার্দ্যের অবয়বে আমি জেগে রয়েছি।

দু'একটা ঘাসের ডগা কখনো সখনো গভীর থেকে এক অপূর্ব সম্ভাবনাকে ইন্দ্রিয়ের দৃশ্যে নিয়ে আসে। আমি নিঃসন্দেহে বুঝি আমাদের স্পর্শে রোদ রয়েছে, বৃষ্টি রয়েছে। যদি দ্যাখো বহতা নেই সবুজ নেই তবে অপেক্ষা কোরো না, আমার নিকটে এসো, আমরা অবোধ্য ফাটলে আমাদের শিরা-উপশিরা বিন্যস্ত করি। তাহলে আমরা উৎসারণের মুখ পাব। আমাদের সব কথাকে শস্য আর পুষ্পের মাঠে রূপান্তরিত হতে দেখব।

বিমলচন্দ্র ঘোষ
(১৯১০)

এক ঝাঁক পায়রা

উজ্জ্বল এক ঝাঁক পায়রা
সূর্যের-উজ্জ্বল রৌদ্রে
চঞ্চল-পাখনায়-উড়ছে।

নিঃসীম-ঘন নীল অম্বর
গ্রহতারা থাক যদি থাক নীল শূন্যে।

হে কাল হে গম্ভীর,
অশান্ত সৃষ্টির
প্রশান্ত মন্থর অবকাশ,
হে অসীম উদাসীন বারোমাস!

চৈত্রের রৌদ্রের উদ্দাম উল্লাসে
তুমি নেই, আমি নেই, কেউ নেই,
শুধু শ্বেত পিঙ্গল কৃষ্ণ
এক ঝাঁক উজ্জ্বল পায়রা।

দুপুরের রৌদ্রের নিঃঝুম শান্তি
নীল কপোতাক্ষীর কান্তি
এক ফালি নাগরিক আকাশে
কালজয়ী পাখনার চঞ্চল প্রকাশে—
চৈতালি সূর্যের থমথমে রৌদ্রে
জীবন্ত উল্লাসে উড়ছে
পাঁচরঙা এক ঝাঁক পায়রা।

একফালি আকাশের কোল-ঘেঁষা কার্ণিশ
রং চটা গম্বুজ দিগন্তে চিমনি,
সোনার প্রহর কাঁপে চঞ্চল পাখনায়
ছোট্ট কালের ঘোরে প্রাণ তবু তন্ময়
লীলায়িত বিস্ময়
সৃষ্টির এক ঝাঁক পায়রা।

রুপালি পাখায় কাঁপে ত্রিকালের ছন্দ
দুপুরের ঝলমলে রোদ্দুর
হে কপোত, পারাবত, পায়রা
যে দিকে দুচোখ যায় দেখা যায় যদ্দুর
রুপালি পাখায় আঁকা শূন্য।
আকাশী ফুলের শ্বেত পিঙ্গল কৃষ্ণ
কম্পিত শত শত উড়ন্ত পাপড়ি
তুমি নেই, আমি নেই, কেউ নেই,
দুপুরের ঝলমলে জীবন্ত রৌদ্রে
ওড়ে শুধু এক ঝাঁক পায়রা।

অঙ্গীকার

অচেনার পালা শেষ হয়ে গেছে তুমি
আমার জীবনে এনেছো অঙ্গীকার,
পরিচিত ঝড়ে স্বপ্নের বনভূমি
সুচির নিয়মে ভেঙেছে বারংবার॥

দীর্ঘশ্বাসের বাষ্প-কুহেলি কবে
মিশে গেছে চড়ারোদের দ্বিপ্রহরে
কেঁপেছে আকাশ সূর্যমুখীর স্তবে
মহাপরিচয়ে স্তম্ভিত চরাচরে॥

তোমার আমার স্বপ্নে সংঘাতে
জীবনকুঞ্জে ফুটেছে রক্তজবা
অচেনা অন্ধ-রাতজাগা বেদনাতে
দিলে পরিচয় রোমাঞ্চ-সম্ভবা ॥

আমার অগ্নি-বিহঙ্গ-চেতনার
ক্ষিপ্রডানায় জ্বালালে মুক্তিশিখা
অপরিচিত তাই দেশকাল-পারাবার
তুমিই শেখালে প্রেম নয় মরীচিকা ॥

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মৈত্র
(১৯১১)

মধুবংশীর গলি

তোমারই প্রেরণা পেয়েছি
বারে বারে আনন্দে গেয়েছি
নিরঙ্কুশ এ জীবনের কলনাদে ভরেছে অম্বর।
হে পঁচিশ নম্বর
মধুবংশীর গলি,
তোমাকেই আমি বলি।
রৌদ্রস্নাত খাটুনির পর সমস্ত দিন
মেরুদণ্ডহীন
মানুষগুলিকে সম্মান করে,
ঘৃণা করে আর হিংসা করে,
নগ্ন নগণ্য সন্ধ্যাকে পাই
—তোড়াবাঁধা শ্মশানে পাঠাবার ফুল—
একটা অন্যায় শৌখিনতায় মন হারায় কুল,
ঘ্রাণ নিই প্রাণ ভরে।
হলদে আকাশ থেকে কার আশীর্বাদ যেন পড়ে ঝরে।
ছারপোকার দৈনিক খাদ্য হিসাবে তাই
খাটিয়ার ওপর বসি, বিড়ি ধরাই
আর, মনে মনে প্রতিজ্ঞা রোজ করি—
দোহাই পতিতপাবন হরি,
আর নয়, আমার লম্পট প্রবৃত্তিগুলিকে,
দস্যু লোভগুলিকে,
চালান করো আন্দামানে।
তার মানে,

স্বার্থ, অর্থ,
জমিদারি অনর্থ,
টাকা, টাকা আর টাকা,
সমস্ত দিনের হীন বাণিজ্যটাই ফাঁকা।
শ্রান্ত শ্লথপদে তাই
তোমারই দিকে ফিরবার প্রেরণা পাই,
হে অনবগুণ্ঠিতা,
অকুণ্ঠিতা,
পঁচিশ নম্বর মধুবংশীর গলি,
তোমায় চুপি চুপি বলি:
আকর্ষণ? অনেক অনেক আছে,
তোমার শীতে ঠাসা
অমাবস্যার বাসা
ইঁট বের করা দেয়ালের কোণে কোণে।
তেলমাখা পাঁচআঙুলের দাগ, বোনে
পুরনো স্বপ্নের জাল,
মলিন জীবন মহীরুহের ডাল।
তারই নিচে—শ্রীহরি সহায়—আঁকা বাঁকা
কাঠকয়লায় আঁকা,
জগন্নাথের পট পেরেক দিয়ে আঁটা,
কোনো সিনেমা-বনিতার জঘন্য সুন্দর মুখ
আঠা দিয়ে সাঁটা
অপর দেয়ালে। এই আবহাওয়াই সার
অধমর্ণ অস্তিত্বের সাধু টঙ্কার।

কোনো কোনো ছুটির দিনে অবশ্য স্ত্রীর চিঠি পাই,
দেশান্তরে নিবিড় বাহুর আশ্লেষে সময় হারাই,
অক্ষম মিনতির সুর—পড়ি আর তুলি হাই।
তবু চিঠি পাই আততায়ী জীবনের
যখন চাল কিনি চল্লিশ টাকায়,
চায়ে চিনি খুঁজে পাওয়া দায়।

এরই অন্তরালে দ্বিপ্রহর দগ্ধ মরে শুকিয়ে
যাওয়া খড়খড়ে দিনগুলির উপর দিয়ে
দুর্মর বসন্তের দ্বিধাকম্পিত পদধ্বনি শুনি।
দশ আঙুলে নিংড়ে নেওয়া আয়ুর শেষ প্রহর গুণি।
হঠাৎ চিঠি আসে,
কোনো তন্ময় মুহূর্তে।
জানালা গলিয়ে পিয়ন দেয়, কাশে
একটু জানানি হিসাবে। হলদে খামে পোরা
শ্রান্ত বিকেলের রং! ছোরা
শানিয়ে আসে রাত্রি,
ধীরে ধীরে বড়ো রাস্তার চৌমাথা পেরিয়ে,
হিংস্র আগ্নেয় কামনা নিয়ে—
মত্ত আততায়ী আসে—রাত্রি
অনন্ত পথযাত্রী,—
মিলিটারি লরির ঘর্ঘর,
রিকশ'র নূপুর, সুদূর ট্রামের মর্মর,
ধাবমান মোটরের ক্ল্যাক্‌সন্ হর্ণ, আর
মেঘে মেঘে এরোপ্লেনের শব্দের ভার
আকাশ ছেঁড়ে; পঁচিশটা,—
হবে,—চট্টগ্রাম ফেরতা ত্রিশটা,
হবেও বা,—কিন্তু হে অনন্তযাত্রী!
হয় নাই এখনও, হয় নাই শেষ তোর রাত্রি।
আতঙ্কের ঘোমটাপরা রাস্তার আলো,
অতিকৃত কালো কালো,
নৈশজীবনের ছায়াদের ডাকে,
ঘরে বাইরে জানালার ফাঁকে ফাঁকে।
নিরুদ্ধ তৃষ্ণার তাই খুলে যায় খিল,
চলে রণদগ্ধ জীবনের ছায়ার মিছিল,
ক্ষুধার হুঙ্কারে ডোবে উন্মার্গের গান।
বাঁকা টুপিপরা কোনো আমেরিকান
কাপ্তেনের লোলুপ শিস

তরুণী রাত্রির গালে চাবুক মারে। সামরিক আশিস
ঝরে পড়ে বিধ্বস্ত মাথায়,
চালে ডালে কাপড়ে ও মধ্যবিত্ত জীবনযাত্রায়।
কিন্তু ওরা আছে বেশ!
(এ যাত্রাই অবশ্য শেষ)
যারা মধ্যরাত্রে অগাধ নীলিমা চষে নিরীহ ঘুম ভাঙায়,
জেলেদের মতো তাজা মাছ তোলে ডাঙায়,
যারা তোমার আমার অবসরের গান ভেঙে চুরমার করে।
মুক্ত প্রাণে মুক্ত ইচ্ছার সিন্দুকে তালা পড়ে,
শ্লোগানমুখী মন শানানো সঙিনের মতো ঝলক দিয়ে ওঠে,
ফ্যাশিস্ট-বিরোধী সঙ্ঘে যোগ দেয়,
মুখে মুখে ফোটে বিদ্রোহের দস্তর হাসি,
আর, বুকে সামাজিক যক্ষ্মার কাশি।

তবু এক ফালি চাঁদের পিঠে ভর করে রাত্রির আকাশ,
আর সপ্তব্যাহৃতি মন্থন করে অসীম নীল বাতাস,
উঠে আসে শ্রান্ত অন্যমনস্ক পৃথিবীর উপর।
ছিন্নভিন্ন অস্তিত্বের ক্লিষ্টগত ভঙ্গি আনে তারই মর্মর।
পারিশ্রমিকহীন শ্রমে ক্ষয়ে ক্ষয়ে যাওয়া আয়ু
নিয়ে, রুগ্নস্বপ্ন দেখি, দীর্ঘশ্বাসে ভরে যায় বায়ু।
তবু, তোমার চিঠির উত্তর দিয়ে যাচ্ছি ঠিক, প্রতি সপ্তাহে একটা করে
মল্লিক বাগানের চুরিকরা ফুল খামের ভিতর দিই ভরে।
তারপর, বর্গীরা আসে।
আকাশে বাতাসে স্থলে জলে দস্যুদের দুরন্ত পদধ্বনি। ত্রাসে
প্রকম্পিত মৃগীদের মন। অলস দুর্বল স্নেহ কুড়িয়ে নেয় প্রচণ্ড সূর্য।

অগ্নিবর্ষী সকাল বাজালো তূর্য।
মনে হয়, জীবনের যুদ্ধ এল।
কলোনিতে কেরানিরক্তে প্রচণ্ড দোলা,
গম্ভীর স্থির প্রতিজ্ঞাগুলি সারি দিয়ে দাঁড়া
ত্রস্ত মনের সামনে প্রহরীর মতো:

আমাদের প্রত্যেকের ইঁদুরের মতো মরাই শেষ নয়,
তারপরেও মহত্তম ভবিষ্যৎ।
আপাতত তার আগে পলাশ-রজনীগন্ধা-কিংশুকের
পাপড়িগুলি ছিঁড়ে কুটি কুটি
ঝড়ের নখরাঘাতে; মেঘে মেঘে বজ্রের ভ্রূকুটি।
তা হোক অস্ত্রোপচার ও আরোগ্য এই ভরসায়
সকালে উঠি, মাটির ভাঁড়ে চা খাই,
চালের দোকানের সামনে সারি দিই,
সন্ধ্যায় সমীকরণ সমিতির মিটিং থেকে ফিরি।
পাগলেরা বলে কি! সমীকরণ আপনিই হবে
কোনো এক অনিবার্য অমোঘ মুহূর্তে।
ইতিমধ্যে হাত পা ছুঁড়ে যাও,
অদৃশ্য অস্ত্র শানাও
কিছু কিছু মারকাটও চলুক,
যে যাই বলুক
গূঢ় স্বার্থের খেয়ালি আবহাওয়ায় পাল তুলে দাও।
অর্বাচীন! অর্বাচীন!
জানে না সে দুর্ধর্ষ জাপান আর পর্যুদস্ত চীন।
অর্থাৎ কে যে শত্রু ঠিক নেই, নিজেরাই মারামারি করছি,
ঘরে বাইরে মরছি।
শেষে বঙ্কু পালের নির্বোধ চিৎকারে সভা ভাঙে,
আমার মনও। সাময়িক যুদ্ধবিরতি। মরা গাঙে
বান ডাকায় দিনান্তের পরিচ্ছন্ন মর্ষিত মন
অবসন্ন শান্তির স্রোতে।
তাই নিরঙ্কুশ, পবিত্র, নির্মনন অস্তিত্বের পৌরাণিক পুরে,
বাইরেকে ভুলি, ঘরকে ডাকি
একটা বিশুদ্ধ বিশ্রম্ভালাপের ডিকাডেন্ট সুরেঃ
শোনো,
তুমি কোনো,
বরযাত্রার মিছিলে কখনো
বাঁশী-পতাকায় আলোতে মাখানো

নবযাত্রার মিছিলে দেখেছ রূঢ় বিধাতার হাসি।
দূরে,
অতিদূরে,
শ্যামলিম কোন্ মেদুর সুদূরে
চেন নাই বুঝি পরাণ বঁধুরে
স্বল্প আলোকে কান্নায় ঢাকা ব্যথা মুকুলিত হাসি।
উদ্দাম ভালোবাসি
তোমার তন্ময় ধ্যান হয়েছে আকাশ পৃথ্বী
পর্বত প্রাকার—
ধরো, এই ভাবেই যদি বা বুঝাই তোমাকে
তোমার বিকল মনকে—অধুনা যা বিরস মলিন,—
কিংবা পাহাড়ে পাহাড়ে একাকার এই কাজের দিন
তোমার মুখেই বাঙ্ময় এই পাইন বন—
শুনে বলেছ হেসে,
রূঢ় বন্ধুর ধারালো চূড়ার এ সমাবেশে,
চলে যাই দূরে, পার হয়ে যাই ঘুমের শেষে—
বলেছ হেসে।

কিংবা, তোমাকে করেছি লক্ষ্য হে অনন্য গতি
রৌদ্রের মুকুটপরা প্রাণঃপূত দিন।
বিচক্ষণ বণিকের অন্যায়ের আভা
আর মুগ্ধ করে না অগণিত মন।
সম্রাটের অনুকম্পা, প্রভুহীন করুণ কুক্কুর,
পথে পথে ফেরে, দুস্থ শহরে শহরে
শেষ অপমৃত্যুর প্রহরে।
কাহারও পরার্থপ্রজ্ঞা সভাতে সঙ্গতে
ছিটায় শান্তির কণা, গলিত তুষার।
বক্তব্য আমার
এই, যে আমি বহুবার
শিল্পিত মনের চারু বনেদি ভঙ্গিতে
প্রেম নিবেদন করেছি। সঙ্গীতে

ফুটো ঘর ভরিয়েছি কিংবা কূট কবিতার
মহিমায় আত্মপ্রসন্ন হয়েছি।
কিন্তু মন পেলাম কই,
কর্মের প্রভায় উজ্জ্বল, এই করুণ গানের উপনিবেশে!
কাউকে তো দেখি না বেশ বলিষ্ঠ হেসে
জীবনের দ্বিধান্বিত মুঠোয় চাপ দিয়ে
শক্ত করে ধরে পৃথিবীর কঠিন জাগ্রত পিঠের উপর
চলে ফিরে বেড়ায়।

পট যায় ঘুরে।
অন্ধীকৃত রাত্রির শহরে,
পথে পথে সুগভীর ছায়ার বহর,
ষড়যন্ত্রসঙ্কুল ত্রস্ত কবন্ধের ভিড়।
সুর-রিয়ালিষ্ট কবিতার দেশে।
পিকাসো বা যামিনী রায়ের আঁকা
পথঘাট গাছপালা বাড়ি।
ঊর্ধ্বে নীল আঁকাবাঁকা চাঁদ,
তারই নীচে নিরন্ন বুড়োবুড়িদের চাপা আর্তনাদ
ক্লিষ্ট চলাফেরা।
অতঃপর ব্রাহ্ম মুহূর্তে, ঘর্মস্রাবী রাত্রির ওপারে
আলোকসম্ভবা ঊষার ওষ্ঠপুটে ভৈঁরোর অস্ফুট আলাপ।
ক্ষুধার গর্জনে ছিন্ন প্রশান্ত গৈরিক।
অগণন বালকবালিকাদের
বুভুক্ষা মুখর যাত্রা লেক মার্কেটের দিকে।
নিশ্চিন্ত অবিবেকী মনের শৌখিন গান
তিরস্কৃত, পলাতক দিশাহীন দূরে।
তবু ভাল, আমি এই মধুবংশীপুরে
আছি বেশ; এ বেলা ও বেলা
কেটে যায় ব্যর্থ অন্বেষায়।
তোমার মহিম্ন স্তোত্রে মুখরিত আকাশ বাতাস
হে স্বর্ণবণিক! তুমি দীপ্ত হিরণ্ময়।

তোমারই হোক ক্ষয়, হোক ক্ষয়।
(আজ শুনি এক ভরি সোনা একশো ছয়
টাকা।) বুভুক্ষারই জয়।
এ স্বর্ণসন্ধ্যায়
কাতারে কাতারে জমে হিরণ্য শকুন
ডানার ঝাপটে কাঁপে আদিগন্ত স্থবির আকাশ
প্রচ্ছন্ন শবের দেশে।

হ্যাঁ, বলতে ভুলেছি আর এক কথা।
এই তো সেদিন, ট্রেন থেকে দিলো নামিয়ে,
হাতের তলায় সযত্নে চাপা অচল পুরনো টিকিট,—
দিলো কে নামিয়ে অচেনা স্টেশনে
জীবনের ট্রেন থেকে।
তাই সেই থেকে
বারবারই অক্ষম প্রয়াস,
চলন্ত রথের পানে খঞ্জের দুরন্ত অভিলাষ
ব্যর্থ হয়, চূর্ণ হয় ঘৃণার পাহাড়ে
দূরে চলে ট্রেন
দ্রুত—চক্রকঙ্কন ঝঙ্কারে।
সম্রাজ্ঞীর মতো উপেক্ষায়, ফেলে চলে যায়।
আমি থাকি পড়ে কোনো বিষণ্ণ সন্ধ্যায়
শেষহীন চাঁদছত্র উপত্যকায়।
চলেছি কোথায়?
একাকী? ইশারায়
মনে পড়ে দিয়েছিল কেউ এ প্রশ্নের উত্তরও
একাকীত্বের শৌখিনতায়
সমীক্ষার ক্রূর শ্লেষ হেনেছিল সেও।
(তখন অবশ্য বড় জোর
শ্মশ্রুহীন কৈশোর,)
শিল্পকে কাব্যকে বাঁচাবার জন্য তবু
বলেছিলাম, তুমি তো আজো এই মুখেরই প্রভু,

হে অনন্ত প্রেম!
এই জীবনের সান্ধ্যসভায়
তোমার আসর শূন্য হলো
হে প্রেম শূন্য হলো, বিরস গানে
ভরলো আকাশ—(লাগছে না ভালো বলছ?
থামা যাক তবে।)
একাকীত্বের দুস্তর প্রান্তর থেকে কবে
উত্তীর্ণ হলাম উদ্দাম শহরে।
ব্যবহারে, বাণিজ্যে
গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে জোট বাঁধে মনে প্রাণে।
নির্জন শীর্ণ একতারা ডোবে সহস্রের ঐকতানে।
এখন চিনেছি যদিও, আরো অনেককে চিনেছি এবার,
অজ্ঞাতবাসের কঠিন আস্তরণ ভেদ করে
বুঝেছি এবার।
দ্বৈপায়ন হ্রদে ডোবা ভগ্নজানু মন,
তোমাকে দেখেছি বারবার এ শহরে হে দুর্যোধন।
লালসার জতুগৃহে ভস্মীভূত তোমার চক্রান্ত
এনেছে যুগান্ত।
অর্জুন, অর্জুন শুধু!
অর্জুন, অর্জুন আজ লক্ষ লক্ষ জনগণমন
দোর্দণ্ড গাণ্ডীব তাই অতি প্রয়োজন,
বৃহন্নলা ছিন্ন করো ক্লীব ছদ্মসজ্জার ব্যসন।
বিদ্রোহের শমীবৃক্ষে সব্যসাচী অর্থ খোঁজে আজ।
ঘুণগ্রস্ত এই যুগ মৃত্যুজ্বরে কাঁপে হাড়ে হাড়ে,
আরক্ত সূর্যের অস্ত পশ্চিমের রক্তিম পাহাড়ে।
এই বার্তা তৃপ্তি দেয় আমাদের
যাদের,
মন রাঙিয়েছে আগামী যুগের রাঙা আলোয়,
আগতযুগের 'কামারাদেরিতে' যারা মুখর,
আমরা তো জানি স্থির বিশ্বাস করি সবে—
ইতিহাসই দেয় আগুনের রঙে সে স্বাক্ষর।

শোনো শোনো তাই
হে নবীন, হে প্রবীণ, মজদুর, ওহে কৃষাণ,
ওহে মোটা সোটা বেঁটে খেটেখাওয়া কেরানিদল,
হে কাব্যে পাওয়া পলাতক ক্ষীণ কবির দল,
শিল্পীর দল,
হে ধনিক, হে বণিক, আর্য, অনার্য
করো শিরোধার্য—
বৃদ্ধযুগের গলিত শবের পাশে
প্রাণকল্লোলে ঐ নবযুগ আসে।
প্রস্তুত করো তোমাদের সেই সব দিনগুলির জন্য
যখন প্রত্যেক সূর্যোদয়ে পাবে নবজীবনের স্তোত্র,
প্রখর প্রাণরৌদ্রের পানীয় তোমাদের আনন্দিত করবে,
(দুর্বলদের নয়।)

শতধা সভ্যতার পাশে,
লক্ষ কোটি ভগ্নস্তূপের পাশে,
বিদীর্ণ আকাশের নিচে,
উপদ্রুত ঘুমের শিয়রে,
ছিন্নভিন্ন পৃথিবীর বসন্তের পাশে,
লক্ষ লক্ষ নির্জন নিষ্পত্র কৃষ্ণচূড়ার পাশে,
দ্বিধাদীর্ণ জনগণমনে
মহা-আর্বিভাব।

স্বপ্ন জেগে উঠছে, উঠেছে
স্টালিনগ্রাদে, মস্কোভায়, টিউনিসিয়ায়,
মহাচীনে।
মহা আশ্বাসের প্রবল নিঃশ্বাসে
দুর্দমনীয় ঝড় উঠেছে সৃষ্টির ঈশান কোণে।
উড়িয়ে দেবে দিগ্বিদিকে
শুকনো ধুলো
শুকনো পাতা
ঝরিয়ে দেবে।

অন্ধকারের দুর্গের সিংহতোরণ
গুঁড়িয়ে দেবে।
ইতিমধ্যে প্রস্তুত থাকো সবাই
যখন অত্যাচারীদের পতন—
চরম পতন হবে।
প্রাসাদে, বন্দরে,
বাহিরে, অন্দরে, প্রতি গ্রামে, নগরে
লক্ষ লক্ষ মনে, দেশে দেশান্তরে
নীরন্ধ্র নির্মম পতন।
তারপর, অবকাশ।
রাত্রি উঠে আসবে গাঢ় নীল,
স্তব্ধ ডানা পৃথিবীর নীড়ে আসবে নেমে
সুস্থ কামনার স্বর্ণচিল,
প্রতিদিনের জ্বলন্ত অস্তের পর,
শ্রমবিরতির পর।
তারপর সুস্থ মুক্ত অনর্গল প্রাণসঙ্গিনীদের নিয়ে
আবিশ্ব প্রাণ-নৃত্যের আসরে
জমবে ভাল, জমবে তখন
মধুবংশীর গলি,
বজ্রনিনাদে তোমাকেও ডেকে বলি॥

দিনেশ দাস
(১৯১৩)

ভুখ-মিছিল

এই আকাশ স্তব্ধ নীল।
কোনোখানেই
যুদ্ধ নেই
হেথা আকাশ রুক্ষ নীল
নিম্নে ভিড় ভ্রষ্টনীড় মৌনমূক ভুখ-মিছিল।

এখানে নেই টুকরো দূর-দিগন্তের
জ্বলন্ত
এখানে নেই আগুন-ফুল সে বৃন্তের
ফলন্ত
হেথা আকাশ শুষ্ক নীল
নিম্নে ভিড় ভ্রষ্টনীড় মৌনমূক ভুখ-মিছিল।

কোনোখানেই
যুদ্ধ নেই
তবু হাওয়ায় কিসের সুর
আহত আর মুমূর্ষুর
বিষণ্ন।
অন্ন নেই পণ্য নেই বিপন্ন।

আকাশে দাগ কোথাও নেই কঙ্কালের কলঙ্কের
অসংখ্যের।
খোলো নয়ন হে অন্ধ

এখানে আজ ঘোরে না সেই মহাসমর কবন্ধ?
এই দারুণ ক্রন্দনেই
যুদ্ধ নেই? যুদ্ধ নেই?
তবু আকাশ স্তব্ধ নীল
নিম্নে ভিড় ভ্রষ্টনীড় মৌনমূক ভুখ-মিছিল।

প্রণমি

দেখেছি তোমার নামে সবার প্রথমে
শ্রাবণে ধানের শিষে দুধটুকু জমে,
তোমারি তো নামে
বৈশাখে আখের খেতে যত মধু নামে।

তবুও হাজার হাতে হাওয়া দেয় ডাক,
কোথায় মাটির স্বপ্নে শিলীভূত পঁচিশে বৈশাখ।
কোথায় আকাশে বাজে সোনার সরোদ
পঁচিশে বৈশাখী ভোর গ'লে হয় গিনিসোনা-রোদ।

তুমি তো বনস্পতি তোমার পায়েতে থরে থরে
অজস্র শব্দের রং কৃষ্ণচূড়ার মত ঝরে
তুমি এক অবাক মৌচাক
কথাগুলি চারপাশে ঘোরে যেন গুন্ গুন্ সুর এক ঝাঁক।

তোমার ছন্দের নদী জমা হ'ত যদি
পৃথিবীতে হ'ত মহাসমুদ্র-বলয়,
ঝুরঝুরে গানের মাটি জ'মে জ'মে হ'ত
আর-এক নতুন হিমালয়!

আকাশে বরুণে দূর স্ফটিক ফেনায়
ছড়ানো তোমার প্রিয়নাম,
তোমার পায়ের পাতা সবখানে পাতা—
কোনখানে রাখব প্রণাম!

সুশীল রায়
(১৯১৫)

বৈরী

অত হাসিখুসি মুখ নিয়ে কাছে এস না অন্তত
পদে পদে অবিরত কেন কর এমন বিব্রত।
বাহিরের শত্রু যারা তারা তবু মন্দ না নেহাত
তোমার ও তার সঙ্গে জানতাম এটুকু তফাত।

আসুক অনেক শত্রু, করুক এ নগর বেষ্টন
অহোরাত্র তার কথা ভেবে তিক্ত করি না এ-মন।
অথচ পুষ্পের মধ্যে যদি কীট ঢোকে
আঘ্রাণ করার সাধ চুকে যায় তখনি পলকে।

অনুরূপ আচরণ তোমাকে তো কখনো সাজে না
অন্তরে তোমার জায়গা, অন্দরেও ছিল গতিবিধি
সকলেই জানে আমরা উভয়ের এতখানি চেনা
আমাদের বন্ধুত্বের নেই কোনো ব্যাস বা পরিধি।

তুমি যদি বৈরী হবে, তৈরি তবে রয়েছি আমিও
ফটকের ওই পারে গিয়ে তবে হাতে অস্ত্র নিয়ো॥

সমর সেন
(১৯১৬)

নষ্টনীড়

বুদোয়ার ঝোড়ো হাওয়া দিনরাত্রি উচ্ছল,
গ্রীষ্মে পিচ গলে; অকস্মাৎ বর্ষা নামে।
তারপর শরৎ, মহৎ নীল আকাশ অখণ্ড প্রতীক্ষায় স্তব্ধ।
ধানক্ষেতে হেমন্তের ঈষৎ-বিষণ্ণ হাত, দূর গ্রামে কুয়াশা।
বাঙলার ঘরে ঘরে গুপ্তচর এ জিজ্ঞাসা;
এত সবুজ বাসা! ভিটে ভাঙার পালা কি এল এবার?

তোমার পাখি এসে ডাকে
আমার বাগানে,
সূর্য ওঠে, হলুদ আলো সবুজ ধানে—
কিন্তু দুর্দিন এল, এ কী দুর্দিন এল।
মেঘে মেঘে অন্ধকার, ঝড়বৃষ্টি, বিদ্যুৎহুঙ্কার,
এ কী আকাশ,
ভয়াল ভবিতব্যতায় ঘোর আকাশের
শাক্ত গোধূলিতে
ভয়ঙ্কর মন্দিরে দিগম্বরী কালী,
শবাসনে তান্ত্রিকেরা স্তব্ধ,
দিনের ভাগাড়ে নামে রাত্রের শকুন।

নষ্টনীড় পাখি কাঁদে আমাদের গ্রামে
রক্তমাখা হাড় দেখি সাজানো বাগানে।

গৃহস্থবিলাপ

১

যদিবা পাঠালে পৃথিবীতে
তবে কেন দিলে এত ব্যর্থতা ঠাকুর!
শুনেছি পঞ্জিকা মতে
শুভক্ষণে জন্ম অভাগার,
সে লগ্নে গৃধিনীমুখে বাজেনি অশুভ চিৎকার,
কিম্বা অদৃষ্টের ব্যঙ্গে
অতি ধূর্ত কাক সহসা কর্কশ ডাকে
ভাঙেনিকো জননীর প্রসব আবেশ।
সপ্তম সন্তান আমি;
কিন্তু সন্তানের জন্ম আর সর্বনাশ
সমার্থক তখনো হয়নি।
আমাদের বংশে
গ্রাম ছেড়ে পিতামহ প্রথম শহরে আসেন।
রক্তে তার কিছু ছিল পদ্মার উদ্দাম বেগ,
সাক্ষী তার ষোড়শ সন্তান!
গুজব আছে যে গৃহত্যাগকালে
দেবী তাঁকে স্বপ্নে বর দেন:
দুধে ভাতে বাঁচিবেক তোমার সন্তান।
সুতরাং
সবুজ চশমা চোখে আমরণ ছিল,
সে সবুজ আদিভিটের জমিজমার,
কিছু বা আপন পৌরুষের।

২

এ কী ভিক্ষামূর্তি প্রভু!
ভদ্রভাবে দিনগুজরানো অসম্ভব আজ।
কোঁচার পাটে ময়লা জমে,
টেরিও থাকে না ঠিক,

ষোড়শোপচার ব্যঞ্জন কমে।
রাত্রে স্বপ্নহীন ঘুমে
উদ্যত উৎকণ্ঠা জাগে মানস শিয়রে।
যে জাদুতে কাগজ-হুকার
গিয়েছে একদা লাটের মন্ত্রণাগার,
সে জাদুতে আমরা বঞ্চিত।
ভেবে দেখ, কিছু দিন আগে
জ্বর থেকে উঠে অল্পকান্ত রুগী
পেয়েছে অন্তত পান্তা ভাত,
পাশে যার লালচে নুন,
মনোহর কাঁচালঙ্কা বঙ্কিম সবুজ।
আজ তাকে দেখি বেলা দ্বিপ্রহরে
ফ্যান খুঁজে ধোঁকে গৃহস্থের দুয়ারে দুয়ারে
বিরাট নগরে।
একাগ্র ক্ষুধার জ্বালা
দেহ জীর্ণ ক'রে চোখের অঙ্গারে জমে;
নীড় নেই, মারী দিগ্বিজয়ী,
স্ত্রী কন্যা গিয়েছে অন্য পথে
নিরুদ্দেশ নরকে,
সবেধন নীলমণি! কঠিন শরীর
ভেসেছে নদীর জলে।

৩

কুকুর যখন নরভুক,
হেমন্ত সন্ধ্যায় মাঠে বাটে শকুনের ধ্যান,
ন্যায়ধর্ম দেশান্তরী, শঠতার জয়,
পৃথিবীর এলোকেশী বেশ,
রক্তে কি তখনো বাজে পুরোনো নদীর গান?
সুচন্দন বৃক্ষশোভা বিষবৃক্ষ কখনো কি ধরে!
আমাদের শ্রেণী লবেজান,
শ্রোণীভারানত সুন্দরীর কালিদাসী সন্ধ্যা

আমাদের নয়,
নয় ওঠা নামা প্রেমের তুফানে,
বন্ধ কঙ্কণঝঙ্কার, চোখেতে কাজল
রাত্তিরে গভীর ঘুমে
ক্ষীণ সূত্রে বাঁধা খড়্গের মতো
সর্বনাশ সমুদ্যত মাথার শিয়রে।

৪

অনেক ফিরেছি ধনীর পিছনে,
দরিদ্রে কেহ না সম্ভাষে।
বড়লোকে আস্থা নেই আর,
দেখেছি দেশের দুর্যোগে
কী উপায়ে কাঁচা টাকা ভাঁড়ু দত্ত করে।
মাঠে মাঠে সোনার ধান,
কোথায় ধান!
সোনা জমে তাদের ভাণ্ডারে।

শবগন্ধ অন্ধকারে
রাস্তায় কঙ্কাল যদি জমে
তারা বলেঃ সবি মায়ার ছলনা,
কে বাঁচে কে মরে কেউ জানে না,
হরিই চরম সান্ত্বনা।
ভবের ব্যাপারে তিনি ব্যাপারী,
খরনদীতে তিনি কাণ্ডারী,
আমরা অধম চালের ব্যাপারী,
দিনে রাতে সই কত লাঞ্ছনা!
ধান যদি ধরে রাখি লোকের গঞ্জনা,
মাল ছেড়ে দিলে হায় ক্ষতির যন্ত্রণা,
যোগেতে লাঞ্ছনা, ভোগেতে লাঞ্ছনা,
হরির চরণ সান্ত্বনা।
চাল চেপে রেখে শত্রুনাশ
তাঁরি তো মন্ত্রণা।

৫

অকালমরণ শেষে এ কাল সমরে!
তোমাকে জানাই বন্ধুঃ
পথে বাধা পর্বত আকার,
ঘুণধরা আমাদের হাড়
শ্রেণীত্যাগে তবু কিছু
আশা আছে বাঁচবার।
যারা মাঠে খাটে,
উদ্দাম নদীতে জাল ফেলে
মাছ ধরে যারা আনে হাটে,
ধান জল বিদ্যুৎ কয়লা
আনে যারা নগরিয়া ঘরে ঘরে,
সরায় ময়লা, দুধ দেয় যে গয়লা ,
তাদের মিতালি খুঁজি।
তাদের জীবন কর্কশ কঠিন,
হয়তো মলিন
নিরক্ষর অতীতের জগদ্দল চাপে,
তবু তারা কালের সারথি,
তাদের দোস্তি, তাদের গতি
আমরা পরমা যতি।

শহরে

মহিষবর্ণ জগদ্দল মেঘে
দিগন্ত রুদ্ধ করে বৈশাখের এ-দিন।
শহরের প্রান্তে
জমাট অন্ধকারে কর্দমাক্ত স্তব্ধতায়
দুর্ভিক্ষের কঙ্কাল চলে আপন পথে;

পশ্চিমে চটকল, গঙ্গা; মধ্যে সুপ্ত শান্ত প্রাসাদে
বর্ধিষ্ণু মেদে নিদ্রারত কুবেরদুলাল;
আরো আগে বিস্তীর্ণ মাঠ, ঘনিষ্ঠ সবুজ।

কী অতীত, কী স্মৃতি মনে জাগে,
শুধু শূন্যমাঠ, পোড়োবাড়ি, গ্রামের শকুন!
তামাটে প্রান্তরে ব'সে মানুষ কি জানে
রাত্রির কালোঘামে মলিন জীবন-উর্বশী
এখনো নৃত্যরতা কালের তপোভঙ্গে;
মেঘে মেঘে গুমোট জোয়ারের ডাকে,
চকিত বিদ্যুতে, সে কি ভাবে,
তার অসহায়, দগ্ধগৃহ, দুগ্ধহীন শিশু
স্খলিত পায়ে দুর্ভিক্ষ পার হয়ে পাবে দেশান্তরী দিন
জনক সূর্যের আশীর্বাদে পরিচ্ছন্ন গ্রাম?

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়
(১৯১৬)

রানি লছিমার সঙ্গে সেদিন

সেদিন লিখতে ব'সে দেখি
কবিতার খাতার পাতায়
শিবসিংহের বনিতা কি?
খিড়কিটা খুলে কোথা যায়?

উজর বিহানক পাশ
পেখলু নহাইলি গোরী
কতি সঙে রূপ ধনি আনলি চোরি—
খনে পেখি দশনক ছটাছট হাস
খনে খনে অধর আগে করু বাস।

সেদিন লিখতে ব'সে দেখি
কবিতার খাতার পাতায়
রানি লছিমার মতো কেউ
এসে বুঝি উঁকি মেরে যায়।

গাওত কাঞ্চন গোরী
মিলনক মোহে ভই ভোরি
হানত নেহারনি বঙ্ক
তাতল সৈকতে মোরি
বরিখত চন্দন-পঙ্ক।

সেদিন লিখতে ব'সে পাই
তাঁকেই তো খাতার পাতায়
বিদ্যাপতি বসালেন যাঁকে
পরকীয়া রাধা ভূমিকায়।

মঝু হিয়ে বীণা কপিনাস
বাজত; বিহানক পাশ
পেখলুঁ গোরোচনা গোরী
কুচ জনু কনক কটোরী
খনে ঝাঁপই, খনে করত উদাস।

সেদিন লিখতে ব'সে দেখি
কবিতার খাতার পাতায়
প্রেমগুঞ্জনে মৃদুভাষ
আচমকা মূর্তি নিতে চায়।

খেলত মেহে জনু বিজুরীক লতা
ধম্মিলে তৈছন হেরু সো চারুতা—
ঝুঁটক বন্ধন মল্লিকা-মালে,
কালিয়া-চর্চিত তিলকহি ভালে,
অঙ্গে চিক্কণ বসন ওড়ল,
চরণে যাবক, মল্ল-তোড়ল
বাজত রুণু-ঝুনু তালে।

সেদিন লিখতে ব'সে দেখি
কবিতার খাতার পাতায়
বিদ্যাপতি-প্রিয়া আবির্ভূতা
উপযাচিকার ভূমিকায়।

যঁহা যঁহা ঝলকত অঙ্গ
তঁহি তঁহি বিজুরী-তরঙ্গ

যঁহা যঁহা কুটিল কটাখ
তঁহি স্মর-শর লাখ লাখ।

যেই শুধালাম—তুমি কে?
সকালের আলোয় অথৈ
অমনি মিলালো কোথা সে—
লখইতে ন পারই কোই।

মানত সবহি যব পরভাত
হমে লাগল আঁধিয়ার।
খোয়লুঁ জীবনক প্যার।
শূন ভেল হিরদয়
শূন ভেল নগরী
শূন ভেল দশদিশ
শূন ভেল সগরী
সো বিহান ভেল উদাস।
রোয়ল পিক, বহি গেল মধুমাস।

কবিক কুঞ্জ পর যব ধনি যাওতই
অনুপাম তছু অভিসার—
বিশ্ববন্দ্য কবি রহ চিত উচকই
হেরইতে পুন সো শিঙার।

হরপ্রসাদ মিত্র
(১৯১৭)

বেয়াড়া

বিশ-হাজার কচি ছেলেমেয়েরা
শুধু এই কলকাতা-শহরে
ঝি-চাকর হয়ে আছে শুনলুম।
খবরটা বাড়ছেই বছরে।

মন কারো ভালো নেই, সত্যি।
তবু বেঁচে থাকাটাই লক্ষ্য
ঈশ্বর নিশ্চয় দেখছেন—
দুটি শ্রেণী—ভক্ষক ও ভক্ষ্য।

সময়টা অতিশয় বেয়াড়া—
তাহলেও আষাঢ়ের গুমোটে
কালিদাস-বন্দনা চলবেই
ছিটেফোঁটা বিষ্টির সুযোগে।
যদিও মেজাজে নেই ফুর্তি
রেবা ও শিপ্রা মনে পড়বেই।

কবিতার সুখ-অসুখ আলাদা।
বাস্তবে ফ্যালো কড়ি, মাখো তেল।
প্রতিবাদে কী যে ঘটে জানা তা,
ন্যাড়া তাই খোঁজেই না পাকা-বেল।
হাঁটাহাঁটি শুধু নিজ-এলাকায়—
মাথাটা বাঁচিয়ে যাতে বাঁচা যায়।

১৯৮২

কবিতা-গল্প-নাটক

কবিতা বানানো শক্ত যদিনা ভেতরে মেঘেরা ঝাম্‌রায়।
ছোটো ঘরটাতে আকাশ কোথায়?
আছি ঠাশাঠাশি—তাই না?
সুখ ও দুঃখ মামুলি।
চেষ্টাই নেই ধানের সবুজ
দু'মুঠিতে ধরা আঁজলায়।

গল্পেরও জোড় মেলানো কঠিন যদিনা লোকের মেলাতে
ঘুরতে ঘুরতে ভাল লেগে যায়
মেতে ওঠা যায় খেলাতে।

নাটক তো নয় কবুতরদের বকম্-বকম্ ঠোঁট
টিকিট-খরচা যৎসামান্য, মিলন-বিরহ-জোট;
না, না,—সেরকম নয়।
হাতুড়ি, নেহাই, হাঁপর, আগুন
মিললে নাটক হয়।

যেদিকে উজান বেগের ক্রমেই মন্দ মন্দ ক্ষয়—
স্বখাত সলিলে ডুবতে ডুবতে সকলেই পৌঁছায়।
সেটা প্রাণহীন বিষাদ কিংবা অবসাদ
—যাই বলো,
গোধূলির আলো-আঁধারীতে দেখা
কামরাঙা, জলপাই।

১৯৮৩

অশোকবিজয় রাহা
(১৯১৭)

একটি সন্ধ্যা

বেতারে কার সেতার বাজে, বাঙলা খবর শেষ,
শুনে শুনে পথ দিয়ে যাই, মনে সুরের রেশ,
মফস্বলের শহরতলি খানিকটা বন-ঘেঁষা,
ঝোপে ঝাড়ে সন্ধ্যা নামে বুনো গন্ধে মেশা,
বাঁকের মোড়েই হঠাৎ আসে রাঙা মাটির টিলা
ওর পিছনে উঁকি মারে পাহাড়টা একশিলা,
শেয়াল-ডাকা রাত্রি আসে যেই আসি ওর কাছে,
বাদুড়গুলা ঝাপট মারে কাক-ডুমুরের গাছে,
মাথার উপর ডাকল পেঁচা, চমকে উঠি—আরে!
আধখানা চাঁদ আটকে আছে টেলিগ্রাফের তারে!

রামেন্দ্র দেশমুখ্য
(১৯১৭)

হাজার বছর পরে

শিল্পের বিহঙ্গ আমি কবিতার খোঁজে
আবার ফিরব দেশে। দেখব দুটি আকুল তারায়
হাজার বছর পরে চন্দনধারায়
স্বর্ণকেশী ভাগীরথী নীল চোখে
মরিচমেথির কুঞ্জে নেচে নেচে
মমতাসিন্ধুর গান গায়।

মাগো সেই শারদ সকালে
হাজার বছর পরে ডালিমের ডালে
বিমুগ্ধ বিহঙ্গমনে সেদিনের তরুণ স্তবকে
দেখব সুখে ফুলবনে স্বর্ণশ্যাম কুমার কুমারী
মুক্তহাসি শিশুকবি মনের আনন্দে গায়
ঐকতানে আনন্দভৈরবী।

শিল্পের বিহঙ্গ, মাগো কবিতার খোঁজে
আবার ফিরব দেশে। দেখব দুটি আকুল নয়নে
কলকাতার বাতায়নে যৌবন সৌরভে
চিবুকে নিঃশ্বাস ফেলে সেদিনের কোমল বাতাস,
অনন্ত লাবণ্যভরা হাজার ভবনে
এ যুগের নেই দীর্ঘশ্বাস।

অন্তর্জ্বালা অপমান সব লুপ্ত মায়াবী আলোয়
কবিতার মনোজয়ী ললিত রমণী লাস্যময়ী,
মাগো আমি আসব ফিরে এই দেশে
আমি রোমাঞ্চিত হব পরমাণু যুগের বিস্ময়ে
হাজার বছর পরে স্বপ্নফুলে
জন্মভূমি, জন্ম নেব গঙ্গাকূলে।

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
(১৯১৭)

মহুয়ার রাত

আশাভঙ্গের রঙ ভাদ্র-শেষ পশ্চিম আকাশে
সব শূন্য একাকার। বুদ্বুদের মতো শুধু ভাসে
নানান চোখের স্মৃতি। জল-ভরা টলটলে
বৈশাখের বুক খাঁ-খাঁ। শ্রাবণের জলে জলে
অতল গভীর স্বাদ।

আশাভঙ্গের ক্ষণ
অঙ্গীকারে আবদ্ধ কোরো না।
ফিরে নাও কৃপণের মতো
মিলনের ক্ষণকাল। বিচ্ছেদের মোহনা-বিস্মিত
তনুর তনিমা।
ফিরে নাও মুখ চোখ হাত
আর স্বেদবিন্দু। আর মহুয়ার রাত।।

৩০।৮।৬২

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত
(১৯১৮)

স্বদেশ

এই ভালো, এই ঘর; অমল প্রলেপে পরিপাটি
নিকানো উঠোনটুকু, শাদা ফুল, শান্ত তরুবীথি
আনন্দে নোয়ায় মাথা, কচিবৃন্তে জীবনের গীতি
আনে হাওয়া, আনে রৌদ্র; অদূরেই সোনামাঠে খাঁটি
প্রাণ জাগে থরে থরে; সার, বীজ, জলের সঞ্চারে
সৃষ্টির রহস্য জাগে, নীলাকাশ থেকে নেমে আসে
স্নিগ্ধ, শান্ত নবধারা; কৃষকের লাঙলের ভারে
মাটির গহনে বেগ, অদূরে পুকুরে জলে ভাসে
সঞ্চিত শেহলা শ্যাম, স্নিগ্ধ শান্ত হিমেল হাওয়ায়
সন্ধ্যায় শরীর কাঁপে, দীপ জ্বলে, ধেনু ফেরে ঘরে
চেনাপথে দলে দলে চাঁদ ওঠে, রহস্যছায়ায়
কাঁপে মাধবীর শাখা, সারা মাঠ মেঠোগন্ধে ভরে।

এই ভালো, এই দেশ; মায়ের শিশুর স্মিত হাসি,
প্রৌঢ়ের বিগত স্মৃতি, যুবকের নিভৃত উদ্যম
মাটি ও মাঠের কাজে,—পর্ণ কুটিরের অধিবাসী
সুখে দুঃখে দ্বন্দ্বে গড়া; এখানে প্রশান্তি নিরুপম
সামান্য সংসার ঘিরে ,—অগ্নিহোত্রী মানুষেরা খাঁটি
স্বদেশকে খুঁজে খুঁজে এই খানে পেয়েছিল মাটি॥

১৯৫৪

মণীন্দ্র রায়
(১৯১৯)

ইয়াসিন মিয়া

দেখা হল সব্জির বাগানে।
তখন বিকেল। ছোট চারাগুলি ইয়াসিন একা
দ্রুত পরিচর্যা করে। শূন্য দিকসীমা।
অবনীর ডাকে ফিরে তাকাল যখন
রৌদ্রবিচ্ছুরিত মুখে ঘামে-ভেজা জ্যোতির আভায়
ফোটে যেন ঋষির মহিমা।

এ-ছিল অকল্পনীয়। বাজেপোড়া অশথে পিপুলে
হয়তো বা কিশলয় জাগে, কিন্তু মানুষে কি অতো
দারুণ বিষের জ্বালা পার হ'য়ে নীলকণ্ঠ কেউ!
অবনী তো আজো সেই বৈশাখের ঝড়ে
বাসাভাঙা ডানা তার আকাশের পরিক্রমা থেকে
ফেরাতে পারেনি কোনো শাখার উপরে।

একই গ্রামে ছিল দুইজনে
বহুদিন। অবনী যুবক, ঘুরে ফিরে
অবশেষে এখানেই পাঠশালার ম্লান শিক্ষাব্রতী।
ইয়াসিন চাষি, তার একক সন্তান রহিমের
বিবাহের স্বপ্নে ভোলে মৃতদার প্রৌঢ়ের বিষাদ।
এরি মাঝে এল সেই ভয়ঙ্কর ক্ষতি।

দৃশ্যের আড়ালে বুঝি আরো কিছু আশ্চর্য ঘটনা
ছিল, অবনীর মন উচ্ছল ঢেউয়ের

নিচে কী জটিল স্রোতে জীবনের দুদিকের পাড়
ভাঙে গড়ে তা জেনেছে, নিজেকেও সরিয়ে রাখেনি।
'তোমারি প্রতিমা গড়ি মন্দিরে' শিখেছে কবে, আর
এখন সে হাতে নিল তীক্ষ্ণধার ছেনি!

খবরের কাগজে সবাই
পরবর্তী ইতিহাস জেনেছে, হাজার
চাষির খামারে ওঠে তেভাগার উপদ্রুত সাড়া।
সেদিন সুলালগঞ্জে হিংস্র ক্ষুধা খাণ্ডবের রোষে
জ্ব'লে গেল কতো ঘর—একটি কিশোর
সূর্যাস্তের সে তিমিরে প্রাণ দিয়ে হল সন্ধ্যাতারা।

এখনো স্মৃতির পটে দেখা যায় রহিমের দেহ—
রক্তপরিপ্লুত, মৃত, চোখে তবু কী এক জিজ্ঞাসা!
অন্ধকারে জোয়ারের মতো তার ক্ষুব্ধ ঢেউয়ে ঢেউয়ে
দড়ি ছিঁড়ে ভেসে গেছে অবনীর মন।
দীর্ঘ দু'বছর জেলে ভেবেছে, কী বলে ঐ গ্রামে
দাঁড়াবে, কী অভিযোগ শুনবে তখন!

আর, প্রথমেই দেখা তারি সঙ্গে যার
সর্বস্ব গিয়েছে, যার জীবনের আশার শিকড়ে
পরুষ কুঠার নেমে শুকিয়েছে উদ্ভিন্ন মুকুল।
মনে হল ফিরে যাবে, কিন্তু ঐ শিরা ওঠা হাতে,
শ্বেত কাশগুচ্ছ চুলে, বসার ভঙ্গিতে, দ্রুত কাজে
কী করুণ স্নেহ ছিল, দেখে চোখ পারেনি ফিরাতে।

কাছে গিয়ে ডেকেছে সে, 'ইয়াসিন মিয়া,
ভালো আছ?' 'খোদাতালা রেখেছে যেমন!'
'আমি অপরাধী!' 'সে কি। সকলেরি আয়ু
এক নয়। বড় কথা, কে কেমন কাজে তা ফুরায়।
আল্লার বিচারে জানি রহিম করেনি কোনো ভুল।

কবে এলে মাস্টারমশায়?'
অবনী বসল ঘাসে। একথা-সেকথা
ব'লে অবশেষে তার মনের কপাট
খুলেছে সে, 'বল তো কী ক'রে
পার হ'য়ে এলে ঐ দুঃখের সাগর?
বল তো কী ক'রে আছ বেঁচে?'—
একালের নচিকেতা খোঁজে যেন রহস্যের জড়!

কতোক্ষণ দূরে চেয়ে ভাবে ইয়াসিন।
তারপর অপ্রতিভ হাসি টেনে বলে,
'সে কথা জানি না। শুধু কাজ করে গেছি প্রতিদিন।
যখনি অস্থির মন, জ্বালা ধরে বুকে,
কাজে ডুবে পেয়েছি আরাম।
এ ছাড়া আর কি আছে! আদাব।' 'সালাম।'

ঝুঁকে ঝুঁকে চলে যায় আসন্ন আঁধারে
শীর্ণ দেহখানি তার। কাজে ডুবে পেয়েছি আরাম?
দুটি পাখি উড়ে গেল; আলো জ্বলে কার আঙিনায়।
পৃথিবী চলেছে। হেসে অবনী জানাল মনে মনে—
এ জীবন এত স্বচ্ছ, বাণী তার এতোই আদিম,
অথচ মানুষ তার লিপি ভুলে যায়!

অতিদূর আলোরেখা

যেন কোনো বনের কিনারে
আজ নয়, অন্য জন্মে, আমি যৌবনের
সহজ নেশায় মেতে, সারাদিন চড়ুইভাতির
আনন্দের কোলাহলে কাটিয়েছি বেলা—
বিকেলে কী ঘুম এল, হঠাৎ জাগার পরে দেখি
ওরা নেই, ভেঙে গেছে খেলা!

ছড়ানো কাগজ, পাতা, শূন্য টিন, নেভানো উনুন,
বহু পোড়াকাঠ, ছাই, এমনকি শালের মঞ্জরী
যা তোমাকে দিয়েছি সকালে, সব ফেলে
সবাই ফিরেছে, তুমি—তুমিও গিয়েছ সহচরী!

মুহূর্তেই পৃথিবীর চেহারা বদলায়।
চারিদিকে ঋজু শাল, হাওয়া নেই, শূন্যতার বুকে
গম্ভীর মাদল বাজে ঘন অন্ধকারে।
মনে হল একা আমি, উৎসবের দিন
অতিদূর আলোরেখা, কোনো ঘরে আর স্মৃতি নেই,
তুমিও ভুলেছ একেবারে!

সুভাষ মুখোপাধ্যায়
(১৯১৯)

মিছিলের মুখ

মিছিলে দেখেছিলাম একটি মুখ,
মুষ্টিবদ্ধ একটি শাণিত হাত
আকাশের দিকে নিক্ষিপ্ত;
বিস্রস্ত কয়েকটি কেশাগ্র
আগুনের শিখার মত হাওয়ায় কম্পমান।
ময়দানে মিশে গেলেও
ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ জনসমুদ্রের ফেনিল চূড়ায়
ফস্‌ফরাসের মত জ্বলজ্বল করতে থাকল
মিছিলের সেই মুখ।

সভা ভেঙে গেল, ছত্রাকারে ছড়িয়ে পড়ল ভিড়
আর মাটির দিকে নামানো হাতের অরণ্যে
পায়ে পায়ে হারিয়ে গেল
মিছিলের সেই মুখ।
আজও দুবেলা পথে ঘুরি
ভিড় দেখলে দাঁড়াই
যদি কোথাও খুঁজে পাই মিছিলের সেই মুখ।

কারো বাঁশির মত নাক ভালো লাগে,
কারো হরিণের মত চাহনি নেশা ধরায়—
কিন্তু হাত তাদের নামানো মাটির দিকে,
ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সমুদ্রে জ্বলে ওঠে না তাদের দৃপ্ত মুখ
ফস্‌ফরাসের মত।

আমাকে উজ্জীবিত করে সমুদ্রের একটি স্বপ্ন
মিছিলের একটি মুখ।

অন্য সব মুখ যখন দুর্মূল্য প্রসাধনের প্রতিযোগিতায়
কুৎসিত বিকৃতিকে চাপার চেষ্টা করে,
পচা শবের দুর্গন্ধ ঢাকার জন্যে
গায়ে সুগন্ধি ঢালে,
তখন অপ্রতিদ্বন্দ্বী সেই মুখ
নিষ্কোষিত তরবারির মত
জেগে উঠে আমাকে জাগায়।

অন্ধকারে হাতে হাতে তাই গুঁজে দিই আমি
নিষিদ্ধ এক ইস্তাহার,
জরাজীর্ণ ইমারতের ভিৎ ধসিয়ে দিতে
ডাক দিই
যাতে উদ্বেলিত মিছিলে একটি মুখ দেহ পায়
আর সমস্ত পৃথিবীর শৃঙ্খলমুক্ত ভালবাসা
দুটি হৃদয়ের সেতুপথে
পারাপার করতে পারে॥

সালেমনের মা

পাগল বাবরালির চোখের মত আকাশ।
তার নিচে পাঁচ ইস্টিশান পেরনো মিছিলে
বার বার পিছিয়ে প'ড়ে
বাবরালির মেয়ে সালেমন
খুঁজছে তার মাকে।

এ কলকাতা শহরে
অলিগলির গোলকধাঁধায়
কোথায় লুকিয়ে তুমি
সালেমনের মা?

বাবরালির চোখের মত এলোমেলো
এ আকাশের নিচে কোথায়
বেঁধেছো ঘর তুমি, কোথায়
সালেমনের মা?

মিছিলের গলায় গলা মিলিয়ে
পিচুটি-পড়া চোখের দুকোণ জলে ভিজিয়ে
তোমাকে ডাকছে শোনো,
সালেমনের মা—

এক আকালের মেয়ে তোমার
আরেক আকালের মুখে দাঁড়িয়ে
তোমাকেই সে খুঁজছে॥

সুন্দর

যখন তোমার আঁচল দমকা হাওয়ায় একা একা উড়ছিল

তখনও নয়।

বিকেলের পড়ন্ত রোদে বিন্দু বিন্দু ঘাম
তোমার মুখে যখন মুক্তোর মত জ্বলছিল

তখনও নয়।

কী একটা কথায় আকাশ উদ্ভাসিত ক'রে
তুমি যখন হাসলে

তখনও নয়।

যখন ভোঁ বাজতেই
মাথায় চটের ফেঁসো জড়ানো এক সমুদ্র
একটি ক'রে ইস্তাহারের জন্যে
উত্তোলিত বাহুর তরঙ্গে তোমাকে ঢেকে দিল
যখন তোমাকে আর দেখা গেল না—

তখনই

আশ্চর্য সুন্দর দেখাল তোমাকে॥

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
(১৯২০)

যুদ্ধের বিরুদ্ধে

চলো আমরা চাঁদের দেশে যাই
চলো আমরা সময় থাকতে যে যার দেশের জাতীয় পতাকা
চাঁদের দেশের সবার চাইতে উঁচু পাহাড়টার
চূড়ায় দিই উড়িয়ে, তার মাটিকে করি সোনার চেয়ে দামী!

পৃথিবীতে কোথাও আর নদী পাহাড় আকাশ
কোথাও আর ঘুমিয়ে থাকার ছ-ফুট জমি নেই।
একটি পাখির বাসা গ'ড়ে তোলার মতো সামান্য আশ্রয়
একটি ঘাসের দাঁড়িয়ে থাকার মাটি
আজ আমাদের অতীত ইতিহাসের স্বপ্ন, ঠাকুরমার মুখের রূপকথা।

মিছেই মানুষ বেতারে টেলিভিসনে সাংবাদিকের গোলটেবিল বৈঠকে
পরস্পরকে নিন্দা করার উজ্জ্বলতায় নিজের মুখ দেখতে চায় আলো
মিছেই মানুষ নিজের দেশের নিজের দলের গর্ব করে।
আসলে তার পায়ের নিচে কোথাও আর মাটির কোন চিহ্ন নেই
হিমালয়ের চূড়ার ঊর্ধ্বে নিশান হাতে ওঠার দেশ নেই
ছ-ফুট জমি মেপে নিয়ে যেখানে উপনিবেশ গড়া যায়।

চলো আমরা চাঁদের দেশে যাই
সময় থাকলে সোনার চেয়ে মূল্যবান চাঁদকে দিই জাতীয় সংগীত।
অতঃপর চাঁদ ফুরোলে, ঠাকুমার শোলোক শেষ হলে
আবার আমরা নতুন অঙ্ক কষব, শনি বৃহস্পতি মঙ্গলের ভূমি
অগস্ত্যের মতো আমরা শুষে নেব, শান্তিকামী মানুষ;
বেঁচে থাকতে ছ-ফুট জমি চাই।

আমার ভারতবর্ষ

আমার ভারতবর্ষ
পঞ্চাশ কোটি নগ্ন মানুষের
যারা সারা দিন রৌদ্রে খাটে, সারা রাত ঘুমুতে পারে না
ক্ষুধার জ্বালায়, শীতে;

কত রাজা আসে যায় ইতিহাসে, ঈর্ষা আর দ্বেষ
আকাশ বিষাক্ত করে
জল কালো করে, বাতাস ধোঁয়ায় কুয়াশায়
ক্রমে অন্ধকার হয়
চারদিকে ষড়যন্ত্র, চারদিকে লোভীর প্রলাপ
যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষ আসে পরস্পরের মুখে চুমু খেতে খেতে
মাটি কাঁপে সাপের ছোবলে, বাঘের থাবায়;

আমার ভারতবর্ষ চেনে না তাদের
মানে না তাদের পরোয়ানা;
তার সন্তানেরা ক্ষুধার জ্বালায়, শীতে চারদিকের প্রচণ্ড মারের মধ্যে
আজো ঈশ্বরের শিশু, পরস্পরের সহোদর॥

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়
(১৯২০)

জননী যন্ত্রণা

জন্মে মুখে কান্না দিলে, দিলে ভাসান ভেলা
একূল-ওকূল কালিঢালা কালনাগিনীর দ'য়
রাত মজাল ডোবাল দিন ঢেউয়ের ছেলেখেলা
সামনে-যে জল, জল পেছনে ভরাডুবির ভয়।
জীবন চেয়ে পেলাম কেবল হাওয়ার হা-হা-হা-হা
পাহাড় থমকে পাথর, নদীর পা-টিপে পথ ভাঙা
বাপের চোখের অভিসম্পাত দূর আকাশের চাওয়া
একটি পাশে আছড়ে পড়ে মূর্ছা বোন : ডাঙা।
ঘাট চাইতে হাট পেরোলাম, গান চেয়ে কান্না
রাতের জন্যে ঘর যা পেলাম—পা তো টানে না
ছায়ার মতো এককোণে বউ, দুয়োরে তার ছা—
হাসতে জানে না বাছা কান্না জানে না।
এক-যে ছেলে, জোয়ান ছেলে, কই সে-ছেলে মা
ঘর-যে তোমার ঘরে-ঘরে, জননী যন্ত্রণা॥

জন্মে মুখে কান্না দিলে, দিলে ভাসান ভেলা
একূল-ওকূল দু'কূল-মজা কালনাগিনীর দ'য়
জলকে দিলাম সাঁতার দিলাম ঢেউকে হেলাফেলা
ভয়কে দিলাম ভরাডুবি—কান্না আমার নয়।
কালিঢালা নদী, বাঁকে ও-কার নৌকো, আলো
নেই-মনিষ্যি তেপান্তরে পথ চিনে কে যায়?
সে আমি সেই আমরা—আমরা কে মন্দ কেউ ভালো
কেউ মাঠে কেউ ঘরে কেউ-বা কলে-কারখানায়।
একটি তারা-পিদিম কখন হাজার তারা জ্বালে:
এক ছেলে হারালে—ছেলে এলাম হাজার জনা
একটি আশা অনেক মুখের পাপড়িতে মুখ মেলে:
এক নামে যেই ডাকলে—অনেক হলাম-যে একজনা।
ক্ষুদিরামের মা আমার কানাইলালের মা—
জননী যন্ত্রণা আমার জননী যন্ত্রণা॥

গোলাম কুদ্দুস
(১৯২০)

দ্বৈরথ

নিচে ভাগাড়ের মড়া মৃত্যুতন্দ্রা হতে দলে দলে
জাগরিত, কলা-পাতে জলবৎ তরল খিচুড়ি
সুপ্তসঞ্জীবনী সুধা! লাইনের শেষে হামাগুড়ি
মেরে আসে সপ্তদশী—শুক্লপক্ষ শশী অস্তাচলে!

তবু দুই চোখে ভরে অস্তমিত আলোর অঞ্জন
ফেলে লুব্ধ দৃষ্টি দূর ক্ষীয়মান অমৃত ভাণ্ডারে,
পংক্তিশেষে রহিবে কি অবশিষ্ট? হাত নাড়ে
মিনতিতে, খুলে পড়ে বক্ষ হতে বিস্রস্ত বসন।

উপরে দোতলা ঘরে দাতাকর্ণ হাতে রেখে মুখ
সেই দিকে চেয়ে থাকে উপবাসী ব্যাঘ্রের মতন,
দু'খণ্ড স্ফুরিত মাংসে স্থির স্তব্ধ দৃষ্টির কৌতুক,
পেশীর অরণ্যতলে শিকারীর বিজ্ঞ বিচরণ,
শীর্ণ শশী গ্রাসে রাহু অবিলম্বে উৎসুক উন্মুখ,
কেহ, হায়, কোনদিন দেখিবে না অন্যের নয়ন।

ভাদ্র, ১৩৫০

অরুণকুমার সরকার
(১৯২১)

দীঘা

জলপিপি রেখে গেছে উজ্জ্বল পালক
বালিতে জরির পাড় বোনে
জগদ্‌বিখ্যাত শিল্পী সন্ধ্যার আলোক
আপনার মনে।

আকাশের মাঠ থেকে হাওয়ার রাখাল
তাড়া ক'রে নিয়ে আসে কালি,
নারঙ্গতরঙ্গভঙ্গে সমুদ্র বিশাল
দেয় করতালি।

আনন্দবিস্মিত ভয়ে বিমৌন স্থবির
এই ভালো, যাব না পিছনে।
সেখানে লম্বিত ছায়া, দিনের শরীর
ক্ষীণায়ু লণ্ঠনে।

অর্থাৎ ব্যস্ততা ভারি হিসেব নিকেশ
সময়ের রাজত্ব শৃঙ্খলা
জটিল কুটিল অঙ্ক, চতুর সুবেশ
শুদ্ধ কারুকলা।

জলপিপি রেখে গেছে উজ্জ্বল পালক
যদি ফিরে আসে পুনরায়
বলব: 'আমাকে দাও দূরের আলোক,
দেবে না আমায়?

যেহেতু তোমার পাখা ভাবনার মতো
উড়ে যায় হাওয়ায় সহজে
আমার শরীর মন চেতনা সতত
তোমাকেই খোঁজে।'

শুদ্ধসত্ত্ব বসু
(১৯২১)

শেষ ওকালতনামা

মৃত্যুর পিছনে ফেউ লাগার মতো
ওরা কারা?
মায়াবসানের বেদনা? অবলুপ্ত স্মৃতিদহনের দুঃখ?
না কি সংসার-রসে শেষ পেয়ালার
তলানিটুকু চুমুক দেওয়ার আর্তি?

ছেলেবেলায় শীতের সময়
একটা মোটা কম্বলে মা আমার
আদুল সারা গা ঢেকে দিত।
সকালে আয়নায় মুখ দেখতাম
অন্ধকারে ধারালো ছুরির ফলার মতো
চকচকে খুশি জমতো মনে।
আজ বয়স্ক রহস্যের আলো যেন
শেষ রাতের প্রহরীর মতো তন্দ্রালস,
নষ্ট নক্ষত্রের হাজার বছর
পূর্বের দীপ্তির মতোই বিভ্রান্তিভরা।

মহীরুহ যতই ব্যূঢ়োরস্ক হোক—
সময় হলে বেল পাকে,
কাকে খাক না খাক;—
সময় হলে গাছের পাতাও ঝরে
টুপটাপ টুপটাপ

ঘরের মসৃণ মেঝে প্রশস্ত দরজা বেয়ে
উড়ে আসে জীর্ণ পাতা সুবাতাসে.....
এ অমোঘ সঙ্গীতের তান লয়
শোনার কথা বলতে হবে কেন?

মৃত্যুর পিছনে ফেউ লাগুক।
ফেউ লাগলে মৃত্যুকে দমন করা যায় না
বয়স্ক গাছ অবশেষে—অবশেষে—
তরুণ, সবুজ, শ্যাম, পীত, হলুদ, শুষ্ক-সুজীর্ণ-ধূসর
অসঙ্কোচে দাখিল করে—
পৃথিবীর অধিকার দিয়ে যাবার
শেষ ওকালতনামা!

আমিও আজ আমার
শেষ ওকালতনামা দিয়ে যাই
পৃথিবীর তাবৎ বন্ধুকে—
যারা এতকাল প্রীতির শক্ত সুতোয়
বেঁধে রেখেছে আমায়!

কনক মুখোপাধ্যায়
(১৯২১)

ঝড়ের সাগরে

ঝড়ের সাগরে শান্ত দ্বীপের নীড়
আর কেন মিছে খুঁজে খুঁজে হয়রানি?
এই তো এলাম আগ্নেয় গোধূলির
মুক্তচেতন সিন্ধু সম্ভাষণে।

এখানে উদার আকাশে নিশানে নিশানে
থর থর কাঁপে মাটির গোলাপ লাল
মিছে তবে কেন বাঁধা আঙিনায় মায়া?
মিছে কেন কাঁদা পুরনো দিনের শোকে?

সেই ভাল, এস নতুন যুগের জ্বালা
এস অস্থির অশান্ত যন্ত্রণা
এ যুগের রূপ বিড়ম্বিতের চোখে
মিছে ফেলে আসা রূপসাগরের মায়া।

আর কেন মিছে মনের গহনে কাঁদা?
এই তো ঝড়ের নিশানে স্বপ্ন কাঁপে,
অগ্নিগিরির ললাটে তপ্ত স্বেদ
সেই তো তোমার আমার অমোঘ প্রেম।

২৭ আগস্ট, ১৯৬৩

রমেন্দ্রকুমার আচার্যচৌধুরী
(১৯২২)

রাজনীতি

রাজনীতি মানেই কতল। শুধু ডিথ ও ডবিথ নয়। ত-সত্ত্বেও কেন
নারী ও পুরুষ রাজনীতি করে সমস্ত যুগেই।
মহাভারতেও তারই স্পষ্ট চিত্র; তাকে ছাড়া সমাজ চলে না।
আর, সে কারণে,
মর্ত্যধামে আসে যায় কত অন্ধকার কতলু খাঁ।
(চরিত্র ও চিত্রকল্প বেঁচে থাকে অক্ষরে অক্ষরে; যাবচ্চন্দ্রদিবাকর।)
সেই মধ্যযুগ গত। আজ বিবর্তিত ক্রমে-ক্রমে অন্য তন্ত্র, অন্য ভাব—
অনেক দেশেই, এ-দেশেও; এসো উপস্থিত সকলেই।
পর পর পাত্র হাতে কবিদের স্বাস্থ্যপান করি।
সভাগৃহে, কতলু! তোমাকে চাই অবশ্যই। সেনাপতি,
লিখে পাঠালাম আমাদের আমন্ত্রণ —
এ-কবিতা, যার বিষয়ে তুমিও, সসম্মানে সঙ্গে নিয়ে যাও।
আমার ওষধি যদি, জ্যোতির্ময় লতাগুলি, জ্বলে ওঠে গভীর রাত্রিতে,
কোনও অজ্ঞাত মুহূর্তে, মাত্র একটিবার, তবেই সার্থক
গূঢ়কোণে আমার সাধনা:
বহু যত্নে বানিয়েছি মণিযোনি যে-শিরোপা,
লক্ষ্ণায় দিলাম কবিকে।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
(১৯২৪)

স্বপ্ন-কোরক

তবু সে হয়নি শান্ত, দীর্ঘ অমাবস্যার শিয়রে
যে-রাত্রে নিঃশব্দে ঝরে পড়ে
মলিন লাবণ্য স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার মমতা,
যে-রাত্রে সমস্ত তুচ্ছ অর্থহীন কথা
গানের মূর্ছনা হয়ে ওঠে,
শোক শান্ত হয়, দুঃখ নিভে আসে, যে-রাত্রে শীতার্ত মনে ফোটে
কল্পনার সুন্দর কুসুম, নামে সান্ত্বনার জল
চিন্তার আগুনে, আর আকন্যাকুমারী হিমাচল
কপালে জ্যোৎস্নার পঙ্ক মেখে
জেগে ওঠে অতলান্ত অন্ধকার সমুদ্রের থেকে,—
তখনও দেখলাম তাকে, কী এক অশান্ত আশা নিয়ে
সে খোঁজে রাত্রির পারাবার,
দুই চোখে তার
স্বপ্নের উজ্জ্বলশিখা প্রদীপ জ্বালিয়ে।

সে এক পরমশিল্পী, সংশয় দ্বিধার অন্ধকারে
সে-ই বারে বারে
আলোকবর্তিকা জ্বালে, দুঃখ তার পায়ে মাথা কোটে,
তারই তো চুম্বনে ফুল ফোটে,
সে-ই তো প্রাণের বন্যা ঢালে
তুঙ্গভদ্রা, গঙ্গায় কি ভাক্‌রা-নাঙালে।
সে এক আশ্চর্য কবি, পাথরের গায়ে
সে-ই ব্রহ্মকমল ফোটায়।

কী যে নাম, মনে নেই তা তো—
আবদুল রহিম কিংবা শংকর মাহাতো,
অথবা অর্জুন সিং। মাঠে মাঠে প্রদীপ জ্বালিয়ে
সে জাগে সমস্ত রাত স্বপ্নের কোরক হাতে নিয়ে।
আমার সমস্ত সুখ, সকল দুঃখের কাছাকাছি
সে আছে, আমিও তাই আছি।

৩ মাঘ, ১৩৬০

দেশ দেখাচ্ছ অন্ধকারে

দেশ দেখাচ্ছ অন্ধকারে:
এই যে নদী, ওই অরণ্য, ওইটে পাহাড়,
এবং ওইটে মরুভূমি।
দেশ দেখাচ্ছ অন্ধকারের মধ্যে তুমি,
বার করেছ নতুন খেলা।
শহর গঞ্জ-খেত-খামারে
ঘুমিয়ে আছে দেশটা যখন, রাত্রিবেলা
খুলেছ মানচিত্রখানি।
এই খানে ধান, চায়ের বাগান, এবং দূরে ওই খানেতে
কাপাস-তুলো, কফি, তামাক
দম-লাগানো কলের মতন হাজার কথা শুনিয়ে যাচ্ছ।
গুরুমশাই,
অন্ধকারের মধ্যে তুমি দেশ দেখাচ্ছ।

কিন্তু আমরা দেশ দেখিনা অন্ধকারে।
নৈশ বিদ্যালয়ের থেকে চুপি-চুপি
পালিয়ে আসি জলের ধারে।
ঘাসের পরে চিত হয়ে শুই, আকাশে নক্ষত্র গুনি,
ছলাত ছলাত ঢেউয়ের টানা শব্দ শুনি।

মাথার মধ্যে পাক খেয়ে যায় টুক্‌রো-টুক্‌রো হাজার ছবি;
উঠোন জুড়ে আল্পনা, আল-পথের পাশে
হিজল গাছে সবুজ গোটা,
পুণ্যি-পুকুর, মাঘমণ্ডল, টিনের চালে হিমের ফোঁটা।
একটু-একটু বাতাস দিচ্ছে, বাতাস আনছে ফুলের গন্ধ;
তার মানে তো আর কিছু নয়,
ছেলেবেলার শিউলি গাছে
এই আঁধারেও ফুলের দারুণ সমারোহ।
গুরুমশাই,
অন্ধকারে কে দেখাবে মানচিত্রখানা?
মাথার মধ্যে দৃশ্য নানা,
স্মৃতির মধ্যে অজস্র ফুল,
তার সুবাসেই দেখতে পাচ্ছি বুকের কাছে।
১৩৭৫

জোড়া খুন

লোভ আমাকে অরণ্যের দিকে টেনে আনে।
তারপর
অচেনা সেই অরণ্যের মধ্যে
ভয় আমাকে দিগ্বিদিকে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়ায়।
আমি ঠিক করেছিলুম,
আমার এই যুগল-শত্রুকে আমি শেষ না করে ছাড়ব না
আগে আমি লোভের মরা মুখ দেখব।
তারপর ভয়ের।

কিন্তু দ্যাখো, কী আশ্চর্য,
লোভের গলায়
আমার দীর্ঘ ও শাণিত ছুরিখানাকে আমূল বিঁধিয়ে দিয়ে
যেই আমি চেঁচিয়ে বলে উঠেছি,
"কিছুই আমি চাই না,"

ভয়ও অমনি, চুপসে-যাওয়া একটা বস্তার মতো, আমার পায়ের তলায়
লুটিয়ে পড়ল।

কখন আলো ফুটেছে, আমি জানি না।
আমি শুনতে পাচ্ছি,
দূর থেকে ভেসে আসছে সূর্যোদয়ের গান।
উদ্দীপক সুরার মতো
সেই গানের সুর ছড়িয়ে যাচ্ছে আমার রক্তে।
শরীরটা খুব হাল্কা লাগছে।
মনে হচ্ছে,
একটা মস্ত বড় ব্যাধির থেকে আমি মুক্ত হয়ে উঠলুম।

আমার সামনে ছিল লোভ।
আমার পিছনে ছিল ভয়।
আমি ভেবেছিলুম,
একে-একে আমি তাদের মোকাবিলা করব।
কিন্তু তার আর দরকার হল না,
একজনকে আক্রমণ করবার সঙ্গে সঙ্গেই দেখতে পেলুম,
অন্যজনও ফতুর হয়ে গেছে।

আবিরের থালা হাতে নিয়ে আকাশ আমার মুখ দেখছে
পাখিরা আমার বন্দনা গাইছে।
বৃক্ষ ও লতা বাতাসে নত হয়ে
নমস্কার করছে আমাকে।
জোড়া খুন সমাধা করে, বাঁ পায়ের লাথি মেরে
আমার দুই জন্মশত্রুর মৃতদেহকে একটা নালার মধ্যে ঠেলে দিয়ে
শিস দিতে দিতে
অরণ্য থেকে আমি বেরিয়ে এলুম।

২৫ আষাঢ়, ১৩৭৭

নরেশ গুহ
(১৯২৪)

কৃষ্ণচূড়া

কৃষ্ণচূড়া! এখনো তুমি আছো?
বৈশাখের রঙ্গালয়ে রঙ্গ শেষ হোলো,
এখনো তুমি আপন মনে নাচো!
আকাশ আঁকে পুরনো পট, ধূসর ছায় ধরা,
এখনো তুমি বর্ণে মনোহরা?
এখনো তুমি তুচ্ছ কর ধূলি!
এখনো তুমি পাথরে বাঁধা শহরে ফুটপাতে
বুলিয়ে দেবে চিত্তহরা তুলি!

কত বুকের কান্না, আর কত বুকের শাপে
ভেবেছিলাম ধরণী বুঝি রিক্ত হয়ে যাবে,
লুপ্ত হবে আকাশঝরা-আলোয় ভরা মাস।
তোমার কানে যায় না কোনো রোদন, হতাশ্বাস?
কোন্ সাহসে বুক বেঁধেছ, কোন্ দুরাশায় বাঁচো?
কৃষ্ণচূড়া, কৃষ্ণচূড়া, এখনো তুমি আছো!

জগন্নাথ চক্রবর্তী

(১৯২৪)

সরলরেখার জন্য

সামান্য একটা সরলরেখার জন্য মাথা খুঁড়ছি,
পাচ্ছি না।
পৃথিবীতে কোথাও একটা সরলরেখা নেই।

আকাশ অপরাজিতা-নীল, কিন্তু গোলাকার,
দিগন্তও চক্রনেমিক্রম,
নদী আঁকাবাঁকা, পাহাড় এবড়োখেবড়ো,
হ্রদ চ্যাপ্টা, উপকূল বুকে-হাঁটা সরীসৃপের মতো খাঁজকাটা,
কুকুরের লেজ কুণ্ডলী, হরিণের শিং ঝাঁকড়া,
গোরুর খুর দ্বিধা, আর গ্র্যাণ্ডট্রাংকরোড উধাও কিন্তু এলোমেলো।
সৃষ্টিতে সরলরেখা বোধ হয় এখনও জন্মায়নি।
যত দাগ সব হয় ডিম, নয় নারকেল, নয় কলার মোচা—
বৃত্ত, উপবৃত্ত ইত্যাদি;
একটাও সোজা নয়।

কোন মানুষই সোজা নয়,
তাই বোঝা শক্ত।
মাথার ওপর সূর্য—জবাকুসুম—
তিনিও সোজা চলেন না,
উত্তরায়ণ থেকে দক্ষিণায়ন
মাতালের মতো টলছেন।

সোজা কিছুই চোখে পড়ছে না।

তোমার চোখের ঈষৎ-ভাষাও
আমার বুকের মধ্যে এসে কেমন যেন বেঁকে যাচ্ছে,
আর আমার সোজা ইচ্ছাটাও তোমার দ্বিধার মধ্যে
কেবলই কৌণিক।

সামান্য একটা সরলরেখার জন্য
আমরা বসে আছি।

কলকাতা কলকাতা কলকাতা

স্বর্গ যদি কোথাও থাকে—আকাশে, মাটিতে, মাটির নিচে,
না, স্বর্গ কোথাও নেই, কিন্তু এখানে এই কলকাতায় রয়েছে
অঙ্কুরিতা নারী যে কোথায় লতিয়ে উঠবে কেউ জানে না,
এবং নিষ্কোষিত পুরুষ, সাহসী, হন্তারক;
আছে নয়নাভিরাম নিউ মারকেট এবং সন্ধ্যাশোভিবিপণির সার,
আর সোনালি মৌমাছিরা এবং তাদের মধুস্করা গুঞ্জরণ, এবং
যে-কোন গলিতে ফলিত জ্যোতিষ, এবং টেবিলে জোড়াজোড়া তৃষ্ণা—
কলকাতা।

এখানে বসন্তের অন্য নাম মিউজিক কনফারেন্স,
শরৎ—প্যানডেলে মাইকের প্রতিশ্রুতি,
বর্ষা—বাসস্ট্যানডের আবছায়া বা বর্ষাতির স্বল্প পরিসরে
প্রথম আশ্লিষ্টসানু প্রেম, এবং
শীত—আপেল, কমলালেবু ও আঙুর।

না, স্বর্গ কোথাও নেই, কিন্তু এখানে রয়েছে
রক্তে ঝিঁ ঝিঁ পোকার স্বর, স্বপ্নে ডায়ালটোন, এবং আয়নায় বিম্বিত
যাকে-ভাল-না-বেসে-বাঁচা-যায় না সেই আমি-আমি-আমি;

রয়েছে কবোষ্ণ নদী নিরবধি এবং উষ্ণ নারী দুরতিক্রম্যা,
আছে সদ্য যুবকের জন্য পার্ক ও রেস্তোরাঁ, সদ্য যুবতীর জন্য যুবক,
এবং উভয়ের জন্য শব্দের মৌচাকে তৈরি ভারতবিশ্রুত কফি হাউস।
না, স্বর্গ কোথাও নেই, কিন্তু এখানে আছে মাহ-ভাদর গঙ্গা,
জালে মসৃণ পেপারব্যাকের মতো রুপো-চিকচিকে ইলিশ, এবং
জলে যেন পোনার ঝাঁক—অসংখ্য নৌকা, গাদাবোট, লন্‌চ,
দাম্ভিক সমুদ্রঙ্গম জাহাজ এবং
হঠাৎ হঠাৎ তীব্র, মাদক উপসাগরের শিস—
কলকাতা।

এখানে কি আছে আর কি নেই?
বালকের জন্য প্লানেটেরিআম, প্রাপ্তবয়স্কের জন্য সিনেমা,
এবং পলিত বৃদ্ধের জন্য ভাগবত,
বন্ধুর জন্য বন্ধুত্ব, তৃষ্ণার্তের জন্য পানীয়, আগন্তুকের জন্য রেশন-কার্ড।
আপনি বিদেশি? আপনি এখানে সুখে থাকবেন;
আপনি বিদেশিনি? আপনিও।
যে-কোন চোখের জন্য কাজল, যে-কোন পাইপের জন্য টুব্যাকো—
এরই নাম কলকাতা।
এখানে কি নেই?
নায়কের জন্য নায়িকা, এবং নায়িকার জন্য ইন্দ্রপুরী,
আবৃত্তির উপযোগী আধুনিক কবিতা, লঘু সুর তুলতে গিটার,
ছবির জন্য প্রদর্শনী এবং তারপর সহৃদয় সমালোচনা।
এখানে ইচ্ছার শেষ নেই, ঈপ্‌সিতও অনন্ত।
বহুনিন্দিত, অনিন্দ্য, এই শো-কেস-সুন্দরী শহরের নাম
কলকাতা।

এই শহর দিনে রাতে সবাইকে টানে।
লাভ দেখিয়ে, লোভ দেখিয়ে, লুকানো ইচ্ছার গায়ে হাত বুলিয়ে,
ব্যাংকের কাউন্টারে নোটের-বান্‌ডিল-শিকারি পিস্তল উঁচিয়ে,
নিলামঘরে হাতুড়ি ঠুকে, পথে নিয়নাভ চোখের চুম্বক দিয়ে, কেবলই টানে।
টালায়, গড়িয়াহাটায়, ধনুকবাঁকা-ওভারব্রিজ ফ্রকপরা মেয়েকে টানে;

এবং উন্মাদিনী লরির চাকা অমনস্ক পান্থকে, মৃত্যু জীবনকে,
রোদ ছায়াকে, ট্রামগাড়ি অফিসগামিনীকে এবং কোল্ড্ ড্রিংক তৃষ্ণাকে
টানে।
এখানে লেকের জল শান্ত এবং গভীর।
সেখানে ভাসমান শাদা বোট, একফালি জুলিএটের বুক, যেন কথা কয়ে উঠবে—
'এস রাত্রি, এস রোমিও, এস তুমি রাত্রির দিবাকর'।
ঘাসে, পাতায়, টেলিফোনের তারে কমলা রঙের সব জোনাকি,
মাটিতে স্ট্র ছড়ানো, এবং পাশে বাদামের খোসা ও আইসক্রিমের বাটি,
এবং খাসা ফুরফুরে হাওয়া।
যদি লেকে না এসে থাকেন তবে আপনি এখনও জন্মান নি।

স্বর্গ কোথাও নেই, কিন্তু এখানে
ময়দানে কে কবে পুঁতেছিল এক স্বর্গের মই—মনুমেন্ট,
যার পায়ে মিটিং, গায়ে ঘোরানো সিঁড়ি, মাথায় ছয় ঋতু।
এখানে সারাদেশের ধিক্কার, রাগ, আহ্লাদ, সারা সংসারের
উত্তেজনা, মঞ্চে ওঠে;
এবং মানুষের সমুদ্রের মধ্যে এই মেঘ-ছোঁয়া মই যখন লাইট হাউস
তখন ইতিহাস তৈরি হয়।
স্বর্গ যদি কোথাও—না, কোথাও নেই,
কিন্তু এই পৃথিবীর ভূগোলে, অন্তহীন আকাঙ্ক্ষার অক্ষরেখায়, রয়েছে
গঙ্গার মতো পুণ্যবতী, মনুমেন্টের মতো ঐতিহাসিক, দক্ষিণ হ্রদের
মতো সাহসিকা—
কলকাতা কলকাতা কলকাতা।

রাম বসু
(১৯২৫)

পরান মাঝি হাঁক দিয়েছে

অনেকক্ষণ বৃষ্টি থেমে গেছে
বৃষ্টি থেমে গেছে অনেকক্ষণ
ফুটো চাল থেকে আর জল গড়িয়ে পড়বে না
খোকাকে শুইয়ে দাও।

খোকাকে শুইয়ে দাও
তোমার বুকের ওম থেকে নামিয়ে
ওই শুকনো জায়গাটায় শুইয়ে দাও
গায় কাঁথাটা টেনে দাও
অনেকক্ষণ বৃষ্টি থেমে গেছে।

মেঘের পাশ দিয়ে কেমন সরু চাঁদ উঠেছে
তোমার ভুরুর মতো সরু চাঁদ
তোমার চুলের মতো কালো আকাশে
বর্ষার ঘোলা জল মাঠ ছাপিয়ে নদীতে মিশে গেছে
কুমোরপাড়ার বাঁশের সাঁকোটা ভেঙে গেছে বোধহয়
বোধহয় ভেসে গেছে জলের তোড়ে
অভাবের টানে যেমন আমাদের আনন্দ ভেসে যায়।

নলবনের ধার দিয়ে
পানবরজের পাশ দিয়ে
গঞ্জের স্টীমারের আলো—
আলো পড়েছে ঘোলা জলে
রামধনুর মতো

রামধনুর মতো এই রাত্তির বেলা।
ধানখেত ভাসিয়ে জল গড়ায় নদীতে
ষ্টীমারের তলায়
আমাদের অভাবের মতো
ঠিক আমাদের কপালের মতো।

আমাদের পেটে তো ভাত নেই
পরনে কাপড় নেই
খোকার মুখে দুধ তো নেই এক ফোঁটাও,—
তবু কেন এই গঞ্জ হাসিতে উছলে ওঠে
তবু কেন এই ষ্টীমার শস্যেতে ভরে ওঠে
আমাদের অভাবের নদীর ওপর
কেন ওরা সব পাঁজরকে গুঁড়িয়ে যায়?

শোন,—
বাইরে এস
বাঁকের মুখে পরান মাঝি হাঁক দিয়েছে
শোন,—বাইরে এস,
ধান-বোঝাই নৌকো রাতারাতি পেরিয়ে যায় বুঝি
খোকাকে শুইয়ে দাও
বিন্দার বৌ শাঁকে ফুঁ দিয়েছে।

এবার আমরা ধান তুলে দিয়ে
মুখ বুজিয়ে মরবো না
এবার আমরা প্রাণ তুলে দিয়ে
অন্ধকারে কাঁদবো না
এবার আমরা তুলসীতলায়
মনকে বেঁধে রাখবো না

বাঁকের মুখে কে যাও, কে?
লণ্ঠনটা বাড়িয়ে দাও

লণ্ঠনটা বাড়িয়ে দাও!
আমাদের হাঁকে রূপনারানের স্রোত ফিরে যাক
আমাদের সড়কিতে কেউটে আঁধার ফর্সা হয়ে যাক
আমাদের হৃৎপিণ্ডের তাল দামামার মতো
ঝড়ের চেয়েও তীব্র আমাদের গতি।
শাসনের মুগুর মেরে আর কতকাল চুপ করিয়ে রাখবে?
এস
বাইরে এস—
আমরা হেরে যাবো না
আমরা মরে যাবো না
আমরা ভেসে যাবো না
নিঃস্বতার সমুদ্রে একটা দ্বীপের মতো আমাদের বিদ্রোহ
আমাদের বিদ্রোহ মৃত্যুর বিভীষিকার বিরুদ্ধে—

এস বাইরে এস
আমার হাত ধর
পরান মাঝি হাঁক দিয়েছে।

তোমার পায়ের নিচে

তোমার পায়ের কাছে স্বপ্ন ছিল
জলস্রোত ছিল, নক্ষত্র নিবিড় মৌন ছিল। আর
গতি ছিল গতিহীনতার দিকে; সময় মঞ্জরী।
তোমার পায়ের নিচে থেকে যেন সৃষ্টির সূচনা
আমি হাত রেখেছিলাম সেখানে

শান্তির নিটোল বৃত্তে মুখ রেখে আমি
নক্ষত্রপুঞ্জের সুগন্ধি নিলাম, সখি।
মন্দিরে বিগ্রহ যদি কথা বলে, যদি দৈববাণী হয়
অথবা সংগীত যদি রক্ত ও মাংসের দেহ পায়
আমি বিস্মিত হবো না।
জানি না তোমার চেয়ে বড় আর কি রহস্য আছে?
তোমার পায়ের নিচে আমাকে অরণ্য হতে হবে
সেখানে আমার মুক্তি, স্বভাবের স্বাভাবিকতায়।
আমি ত ছিলাম পাথরে ছড়ানো বীজ, আলো হাওয়া
যাকে দীর্ণ করে পল্লবের স্থির চরিত্র দেয়নি
তাই মনে হতো ধ্রুব হল চোরাবালি, আর্তনাদ
তবু দ্যাখো আমার চোখের মণি জলস্রোতে ফুল
আর দুই হাত তুলে নিল আরতির দীপাধার
তোমার পায়ের নিচে বৃক্ষ হলে
জীবনের নাম হবে শস্য, সমারোহ।

অরুণ ভট্টাচার্য
(১৯২৫)

পুরোনো চিঠি ছিঁড়ে ফেলতে ফেলতে

হাত বাড়িয়ে কী পেতে চাস্। ভাবতে ভাবতে আমার
সকাল গেল। সন্ধ্যাকাশে তারা
উঠল যখন, মনে পড়ল, হাত বাড়িয়ে আকাশ
চাইলে পাওয়া যায়।

হাত বাড়িয়ে কী পেতে চাস্। ভাবতে ভাবতে আমার
স্বপ্নগুলো দুলে উঠল। রাত্রিবেলা একা
জেগে উঠলাম, মনে পড়ল, হাত বাড়িয়ে হয়ত ভালোবাসা
চাইলে পাওয়া যায়।

হাত বাড়িয়ে কী পেতে চাস্। ভাবতে ভাবতে আমার
শৈশবের ছবিখানা গর্জে উঠল। আমি
ভয়ের মুখোশ পরে কাকে দেখতে পেলাম! না না
হাত বাড়িয়ে যা পেতে চাই তা আর পাবো না।

সরলরেখার মত যেসব দিনগুলি রাতগুলি
গভীর অন্ধকারের মধ্যে মুখ লুকিয়ে থাকছে অন্তরালে
হাত বাড়িয়ে যা পেতে চাই বুকের মধ্যে, তা
আর পাবো না।

সুকান্ত ভট্টাচার্য
(১৯২৬)

ছাড়পত্র

যে শিশু ভূমিষ্ঠ হল আজ রাত্রে
তার মুখে খবর পেলুম:
সে পেয়েছে ছাড়পত্র এক,
নতুন বিশ্বের দ্বারে তাই ব্যক্ত করে অধিকার
জন্মমাত্র সুতীব্র চীৎকারে।
খর্বদেহ নিঃসহায়, তবু তার মুষ্টিবদ্ধ হাত
উত্তোলিত, উদ্ভাসিত
কী এক দুর্বোধ্য প্রতিজ্ঞায়।
সে ভাষা বোঝে না কেউ,
কেউ হাসে, কেউ করে মৃদু তিরস্কার।
আমি কিন্তু মনে মনে বুঝেছি সে ভাষা
পেয়েছি নতুন চিঠি আসন্ন যুগের—
পরিচয়-পত্র পড়ি ভূমিষ্ঠ শিশুর
অস্পষ্ট কুয়াশাভরা চোখে।
এসেছে নতুন শিশু, তাকে ছেড়ে দিতে হবে স্থান;
জীর্ণ পৃথিবীতে ব্যর্থ, মৃত আর ধ্বংসস্তূপ-পিঠে
চলে যেতে হবে আমাদের।
চলে যাব—তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ
প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল,
এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি—
নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।
অবশেষে সব কাজ সেরে,

আমার দেহের রক্তে নতুন শিশুকে
করে যাব আশীর্বাদ,

তারপর হব ইতিহাস॥

একটি মোরগের কাহিনি

একটি মোরগ হঠাৎ আশ্রয় পেয়ে গেল
বিরাট প্রাসাদের ছোট্ট এক কোণে,
ভাঙা প্যাকিং বাক্সের গাদায়—
আরো দু'তিনটি মুরগির সঙ্গে।

আশ্রয় যদিও মিলল,
উপযুক্ত আহার মিলল না।
সুতীক্ষ্ণ চিৎকারে প্রতিবাদ জানিয়ে
গলা ফাটাল সেই মোরগ
ভোর থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত—
তবুও সহানুভূতি জানাল না সেই বিরাট শক্ত ইমারত।

তারপর শুরু হল তার আঁস্তাকুড়ে আনাগোনা:
আশ্চর্য! সেখানে প্রতিদিন মিলতে লাগল
ফেলে দেওয়া ভাত-রুটির চমৎকার প্রচুর খাবার!
তারপর এক সময় আঁস্তাকুড়েও এল অংশীদার—
ময়লা ছেঁড়া ন্যাকড়া পরা দু'তিনটে মানুষ;
কাজেই দুর্বলতর মোরগের খাবার গেল বন্ধ হয়ে।

খাবার! খাবার! খানিকটা খাবার!
অসহায় মোরগ খাবারের সন্ধানে

বারবার চেষ্টা করল প্রাসাদে ঢুকতে,
প্রত্যেকবারই তাড়া খেলে প্রচণ্ড।
ছোট্ট মোরগ ঘাড় উঁচু ক'রে স্বপ্ন দেখে—
'প্রাসাদের ভেতর রাশি রাশি খাবার'!
তারপর সত্যিই সে একদিন প্রাসাদে ঢুকতে পেল,
একেবারে সোজা চলে এল
ধপ্‌ধপে সাদা দামি কাপড়ে ঢাকা খাবার টেবিলে
অবশ্য খাবার খেতে নয়—
খাবার হিসেবে॥

হে মহাজীবন

হে মহাজীবন, আর এ কাব্য নয়
এবার কঠিন কঠোর গদ্যে আনো,
পদ-লালিত্য-ঝঙ্কার মুছে যাক
গদ্যের কড়া হাতুড়িকে আজ হানো।
প্রয়োজন নেই কবিতার স্নিগ্ধতা—
কবিতা তোমায় দিলাম আজকে ছুটি,
ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়:
পূর্ণিমা-চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি॥

কৃষ্ণ ধর
(১৯২৬)

রক্ত গোধূলিতে

একরাশ লোকের ভিড়ের গন্ধ শুঁকে শুঁকে পথ চলছি
মানুষের বাড়ি ফেরার গন্ধ আমি বিকেল হলেই টের পাই
তখন নদীর জল করুণ হয়
তখন স্টিমারের ভোঁ বাজে
আমি তখন কলকাতার পথকেই মনে করি ভাসমান এক বিশাল জাহাজ
তার মাস্তুল গিয়ে ঠেকেছে শহীদ মিনারের চুড়োয়
তার ঢেউগুলি ওই বাড়ি-ফিরতি মানুষের পায়ে চলার সঙ্গে তাল দিয়ে
জলতরঙ্গের মতো বাজতে থাকে এ দেয়াল থেকে ও দেয়ালে
এ রাস্তা থেকে ও রাস্তা
এ তার থেকে ও তারে
এ শাড়ির আঁচল থেকে অন্য শাড়ির আঁচলে।
আমি এই সব শব্দগন্ধদৃশ্য খুব নিবিড়ভাবে গ্রহণ করি
অনেক ছবি অনেক মুখ আমার মনে ভিড় করতে থাকে।
তাদের কথা আমার বাড়ি ফেরার সময় মনে হয়
মানুষের বাড়ি ফেরার মুখ দেখলে
আমার পূর্বজন্মের কথা মনে পড়ে যায়।

আমি মানুষের জন্মের কান্না শুনতে শুনতে
এই রক্তগোধূলিতে নদী পার হই একা একা।

সিদ্ধেশ্বর সেন
(১৯২৬)

আগুন আমার ভাই

সময়ের ডানার ভিতরে
তুমি ছিলে চলচপল অগ্নি
সেই ডানা ঘ্রাণ লেগে পুড়ে গেলে, পাবক
তোমার উলঙ্গ আত্মা চিনি

তোমার বর্বর আত্মা
যা রইল সভ্যতার আগুয়ান মূলে
কিম্বা যা সভ্যবর্বরতা ভেদ ক'রে বিশুদ্ধ মৌলিক অন্তঃপুরে
মানুষের হৃদয়কে পুড়লে

অরণির থেকে আমি কোন আলো জ্বেলে নিয়ে
গুহা থেকে গুহার বিবরে ফিরে, ফের
অবারিত গুহায়
সমাহিতি চেয়ে নয়, সমাধান নিরর্থক চেয়ে
হ'য়ে গেছি চিত্ররূপময়

বাইসন-তিমিরপীঠ পার হয়ে, দ্রুত হরিণীর
পলায়নপর দ্যুতি পেলে
শেষ চিত্রকল্পে কিম্বা বারবার প্রথম প্রতীকে
অতিকায় প্রশ্নে ছায়া ফেলে
আমিই কি রয়ে যাব চিরকাল শিকারীকে ছেড়ে, সেই শিকারের অন্তিম
প্রশ্নের বাহক

দশহাজার হাজার বছরের তাম্রপ্রস্তর সব নির্বিবেকে ভোগ করে এসে
হিমের বলয় ভেঙে বারবার, হিমেরই বলয়ে পলাতক
তুমি স্বত্বহীন সত্তা তবু দীপ্র-ব্রাত্যঅগ্নি, অন্ত্যজ নায়ক
'মা নিষাদ' ব'লে আমি প্রথম আদি কোন বাণী
উদ্গাতার মতো
শুদ্ধ উচ্চারণে ভ'রে পৃথিবীর দিগন্তকে একবারও শুনিয়েছি, এমন কি
সে আদেশ স্মরণরহিত

তমসার থেকে কোন্ তমসায় আমি
কোন্ তমসায় আমি
নেমে
জলে জ্বালি হৃদয়ের শোক

সময়ের কোন্ ডানা গরুড়ের চেয়ে বৃদ্ধ, পরিণামহীন, ভ্রাম্য,
অনুতাপকামী
আমিই দাহ্য আর আমিই সে একক দাহক॥

ভাষা, এমনকী, ভাষার একক

ভাষা, এমনকী, ভাষার একক, বহুমুখ
বহুতায়, ধরো তাকে

এই খাত—উচ্ছ্রিত
গঙ্গোত্রীর—শত তটবাঁক
ভেঙে-ঘুরে, জাগে!

দূষণপ্রবাহেও জাগে, ভাসে
সাঁতারু ও শব

জীবজগতের কণাঅণুবিকিরণ—ভাসে, প্রারব্ধ-
কর্মের অথবা কর্মের
ত্যাগে!!

রাজলক্ষ্মী দেবী
(১৯২৭)

মন্দির

শোনো, আদিবাসী,—আমি আসন্ন সন্ধ্যায় এই মন্দিরে এসেছি।
বিচিত্র দ্বীপের কেন্দ্রে উপনীত হ'য়ে গেছি নারিকেল-গুবাক পেরিয়ে।
কবে আমি দিগন্তের করাহ্বানে দুঃসাহসী ভেলায় ভেসেছি,
দীর্ঘকাল কাটিয়েছি বরফের স্তূপ, ঘূর্ণি, তুফান এড়িয়ে।
—অবশেষে মন্দিরে এসেছি।

শোনো, আদিবাসী,—আমি দৈবী উপচারে কিছু পুষ্প দিতে পারি,
সন্ধ্যায় সুদীর্ঘ দীপশিখা জ্বেলে দিতে পারি দেবতা-সকাশে।
ধূপধূমায়িত এই সুগন্ধি সম্ভ্রান্ত সন্ধ্যা বড়ো মনোহারী,
বিচিত্র দ্বীপের কেন্দ্রে সুরম্য মন্দিরচূড়া গোধূলি-আকাশে।
—পুষ্পদীপ আমি দিতে পারি?

আচ্ছন্ন সন্ধ্যায় ধূপধূমায়িত অন্ধকারে, তুমি—আদিবাসী,
অদৃষ্টের ছায়া থেকে দৃষ্টির গোচরে এলে। প্রস্তরে শানাও
সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা,—আর দুই চোখে খেলা করে ভয়ানক হাসি।
তোমার পূজায় আমি কোন্ উপহার দিতে পারি,—বলে দাও।

অরবিন্দ গুহ
(১৯২৮)

অন্ধকারের দিকে

এক অন্ধকার থেকে চলে যাব অন্য অন্ধকারে।
স্বাদগন্ধ, ভালোবাসা, দু-চোখের জল
ঠিক মতো পাওয়া যাচ্ছে—খানিক নগদ, কিছু ধারে।
রাস্তা কিছু উঁচুনিচু, কিছু সমতল।

শেফালির গন্ধ পেলে মনে পড়ে—আবার আশ্বিন,
আবার আকাশে কিছু লঘুমেঘলীলা।
ঝড়ের বাতাসে উড়ে চলে আসে নাবালক দিন,
দু-চোখের কূলে-কূলে নতুন অছিলা।

পিছে মস্ত অপরূপ অন্ধকার। আমার সেদিকে
মাঝে মাঝে ফিরে যেতে খুব ইচ্ছা করে।
সেদিকে রাস্তার পাশে হাজার হাজার শেফালিকে
চিনে নিতে পারব ভেজা ঘাসের উপরে।

সেদিকে সমস্ত রাস্তা মুখস্থ। সমস্ত অলিগলি,
মন্দিরের শাদা সিঁড়ি, স্নিগ্ধ বৃক্ষতল;
কিন্তু কার কথা রেখে কার কথা সবিস্তারে বলি,
প্রত্যেক বস্তুর দাবি সমান প্রবল।

ফিরে যাওয়া অসম্ভব, অবাস্তব, অননুমোদিত।
কিন্তু সাধ, শিশির, শেফালি, ঘনঘাস
আর ক্লান্ত হরিধ্বনি নিয়ে আসে নক্ষত্রখচিত
আকাশ—সমস্ত অন্ধকারের নির্যাস।

শামসুর রাহমান

(১৯২৯)

সভ্যতার কাছে এই সওয়াল আমার

কী এক আত্মা-কাঁপানো ভয়ের কামড় হামেশা
খেয়েই চলেছি। বুঝি না কোন্ অপরাধে ছুঁচো, ইঁদুর, এমনকি
লাল পিঁপড়েও অস্তিত্বে দিচ্ছে হানা, যেন খেল-তামাশা
পেয়ে গেছে নিখরচায়। পাঁচ মিনিটও শান্তি দোলায় না হাতপাখা,
স্বস্তি ভুলেও রাখো না অধর ওষ্ঠে আমার। কেউ কি
আমাকে বলে দেবে কোন্ মোড়লের বাড়া ভাতে
ছিটিয়েছি ছাই? কোনও গেরস্তের ভিটায়
ঘুঘু চরাবার কল্পনাও তো ঘেঁষেনি মনের কোণে।

যদি নারী শিশুর হাসি, ইয়ার বন্ধু, শান্তিপ্রিয়
মানবসমাজকে ভালোবাসা অপরাধ হয়,
যদি দুপুরের চকচকে ধারালো রোদ্দুর, চরাচর স্নিগ্ধ-করা জ্যোৎস্না,
শ্রাবণের মেঘ, জলধারা, মুক্তাঙ্গনের পুষ্পবিকাশ, পাখির উড়াল
আমাকে পুলকিত করে, আমার হবে কি কসুর, গুনাহ?—
হাজার বছরের সভ্যতার কাছে এই সওয়াল আমার।

তবে কেন আমাকে কাফকার নায়কের মতোই
কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে যখন তখন,
লুকিয়ে বেড়াতে হবে দিগ্বিদিক? কেন হিংস্র আঙুলগুলো
দহলীজে বসে ফরমান রটিয়ে
টিপে মরতে চাইবে আমার পরান-ভোমরাকে?
আমার স্বপ্ন, সাধ, কলম কেড়ে নিতে চাইবে কেন এক ঝটকায়?

সূর্যোদয়, গোধূলিময় আকাশ, নদী আর নক্ষত্রসমাজকে
ব্যাকুল প্রশ্ন করি, আর কত রাত নির্ঘুম
কাটাবো লাল চোখ নিয়ে? কখন বইবে অপরূপ
নহর খরা-পীড়িত জমিনে? কখন আসবে সেই প্রহর,
যখন অশুভের হুঙ্কার স্তব্ধতায় হবে লীন,
যুদ্ধবাজদের হাতে রাইফেলের বদলে থাকবে
সুরভিময় ফুলের তোড়া? মিলনের বাঁশি? অভ্যাসবশত স্বপ্নে
ভেসে বেড়াই আবছা ময়ূরপঙ্খী ভেলায়।

স্বপ্নভঙ্গের ইতিহাস দীর্ঘ অতিশয়, তবুও
মহাপুরুষদের বাণী থেকে শান্তির আভা বিচ্ছুরিত হয়, হতে
থাকবে চিরকাল। দেখি, অবাধ প্রান্তরে প্রশান্ত আলোয়
বালক বালিকারা হরিণ হরিণীর গলায় লগ্ন, মগ্ন খেলায়।
এটাই সত্য হলে, তবে কেন ঢিল খাবো, ক্রুশবিদ্ধ হবো?—
হাজার বছরের সভ্যতার কাছে এই সওয়াল আমার।

আমার ভালোবাসা

সমস্ত নৈরাশ্যের গলায় পা রেখে অ্যানিমার প্রতারণায় ভ্রূক্ষেপ না করে
শিরায় শিরায় লক্ষ তারাময় রক্তের দোলায় আন্দোলিত হয়ে আমি বলছি
আমি বলছি লেখার টেবিল ঘরের চৌকাঠ সাক্ষী রেখে বলছি ঘুরঘুট্টি
অন্ধকারে হাজার পিদিম জ্বালিয়ে বলছি এই সময়ের পাঁকে
ফুটুক আমার ভালোবাসা ফুটুক কালো কারাগারের
দেয়াল ফুঁড়ে খুব হল্লা করে বসন্তের কাঁধে
যারা পেতেছে মেশিনগান তাদের হেলমেট
ছুঁড়ে রাস্তার মোড়ে মোড়ে ট্রাফিক

সিগন্যালে সাইন বোর্ডে বস্তির
জীর্ণ চালায় কবরের কাঁচা
মাটিতে হাসপাতালের নিঃশব্দ
ছাদে আনন্দের ঝাঁ ঝাঁ রৌদ্রে
বিনোদের শব্দে আমার
সূর্যমুখী ভালোবাসা
নবজাতকের মতো
চীৎকার ক'রে
অম্লান ফুটুক ফুটুক ফুটুক ফুটুক ফুটুক ফুটুক
আমার ভালোবাসা সবুজ পাতার মতো গান গায় গান গায় গান গায়।

আনন্দ বাগচী
(১৯৩০)

মানুষের ঘরে

এখনো রয়েছে কিছু পুষ্পগুচ্ছ, পৃথিবী
শেষ অপরাহ্নের রোদ্দুরে
মানুষের ভালবাসা, মানুষের বুকের ভিতরে
এখনো নদীর মত সুবাতাস প্রবাহিত হয়
এখনো পাখির বাসা রূপসী নারীর দুই চোখে
মমতায় গাঢ় প্রতিবিম্ব হয়, এখনো সময়
পৃথিবীর আঙিনায় শিশুর নিকটে খেলা করে।
গির্জায় মাঠের মধ্যে পবিত্র নির্জন জ্যোৎস্না জ্বলে
মন্দিরে অক্ষয়-বট, ঘন্টা বাজে স্বপ্নের ভিতরে,
এখনো হৃদয় ভরে কবিতায়
পুষ্পগন্ধে শিশুর হাসিতে;
সমস্ত প্রবাস থেকে, নির্বাসন থেকে একে একে
সব যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে আসচে দূরের মানুষ,
দুই হাতে রক্ত কারো বারুদে ঝলসানো কারো মুখ॥

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়
(১৯৩১)

দুরূহ আঁধার লেবুবন

শিল্প কি স্বেচ্ছায় যায়, যাবে?
সে তো কক্খনো যাবে না।
খিড়কির আড়ালে মুখ গোঁজ করে বসে থাকবে;
ডাকো—
আয় সোনা, এখানে রোদ্দুর দেবো, বাতাবি লেবুর বল, খেলা,
চলে আয়,
যাবে না সে।
ওর চোখে বিশুদ্ধ সন্দেহ, নখে মাটি,
গর্দানে নির্বোধ হিংসা—
খিড়কির আড়াল থেকে একচুল নড়বে না।
কোলে নিলে পিছলে যাবে; গলায় বক্‌লশ ধরে টানো
ছিঁড়ে যাবে কণ্ঠনালি।
শিল্প এত সহজে নড়ে না।
ওর জন্যে চাই ধূর্ত বিড়ালীর সস্নেহ দস্যুতা
যা ওকে তড়িৎবেগে মুখে ধরে শূন্যে তুলে নেবে
মাছের টুকরোর—না না, নিজের শিশুর মতো।
তারপর
প্রকাণ্ড নিঃশব্দ লাফ:
কুয়োতলা, পাঁচিল, ছাইগাদা পার
দুরূহ আঁধার লেবুবন।
সেখানে ও বড়ো হবে নিরঞ্জন কাঁটার আদরে॥

শঙ্খ ঘোষ
(১৩৩২)

ধ্বংস করো ধ্বজা

আমি বলতে চাই, নিপাত যাও
এখনই
বলতে চাই, চুপ

তবু
বলতে পারি না। আর তাই
নিজেকে ছিঁড়ে ফেলি দিনের পর দিন।

বলতে চাই, জানি
জানি যে আমার মজ্জার মধ্য দিয়ে তোমার
ঘিরে ঘিরে পাক দেওয়া টান

বলতে চাই তোমার শেষ নেই, তোমার শুরু নেই, কেবল জল, লবণ
তোমার চোখ নেই স্নায়ু নেই
শুধু কুসুম

শুধু পরাগ, আবর্তন, শুধু ঘূর্ণি
শুধু গহ্বর
বলতে চাই, নিপাত যাও—ধ্বংস হও—ভাঙো

কিন্তু বলতে পারি না, কেননা তার আগেই
তুমি নিজে
নিজের হাতে ধ্বংস করো আমার ধ্বজা, আমার আত্মা।

বাবরের প্রার্থনা

এই তো জানু পেতে বসেছি, পশ্চিম
আজ বসন্তের শূন্য হাত
ধ্বংস করে দাও আমাকে যদি চাও
আমার সন্ততি স্বপ্নে থাক।

কোথায় গেল ওর স্বচ্ছ যৌবন
কোথায় কুরে খায় গোপন ক্ষয়!
চোখের কোণে এই সমূহ পরাভব
বিষায় ফুসফুস ধমনী শিরা!

জাগাও শহরের প্রান্তে প্রান্তরে
ধূসর শূন্যের আজান গান;
পাথর করে দাও আমাকে নিশ্চল
আমার সন্ততি স্বপ্নে থাক।

না কি এ শরীরের পাপের বীজাণুতে
কোনোই ত্রাণ নেই ভবিষ্যের?
আমারই বর্বর জয়ের উল্লাসে
মৃত্যু ডেকে আনি নিজের ঘরে?

না কি এ প্রাসাদের আলোর ঝলসানি
পুড়িয়ে দেয় সব হৃদয় হাড়
এবং শরীরের ভিতরে বাসা গড়ে
লক্ষ নির্বোধ পতঙ্গের?

আমারই হাতে এত দিয়েছ সম্ভার
জীর্ণ করে ওকে কোথায় নেবে?
ধ্বংস করে দাও আমাকে ঈশ্বর
আমার সন্ততি স্বপ্নে থাক।

সেই ট্র্যাডিশন

পঁচিশ বছর আগের টিউটোরিয়াল:
বলেছিলাম, লিখতে হবে, কেন
ভিন্ন দেশের উড়ো আকাশ ছেড়ে
সৈন্য নামে লেবাননের বুকে।

ছেলেরা সব সামিল ছিল বটে
সেদিন প্রতিবাদের ধর্মঘটে
দেয়ালজোড়া ছিল জীবনযাপন
ফুলকি ছিল ফুটে ওঠার পথে।

দিনের পর দিন পড়েছে ঝুঁকে
বছর থেকে বছর জমায় ঘুণ
তিন-পা পিছোয় চার-পা আবার এগোয়
পঁচিশ বছর মধ্যরাতের শেয়াল।

বাড়ি ফিরব, হঠাৎ দেখি চুণ
ভরছে আবার পুরোনো সেই দেয়াল:
'সবাইকে আজ হাত ওঠাতে হবে
লেবাননের নিজের মাটির থেকে।'

পঁচিশ বছর থম্‌কে আছে তবে?
বুঝতে পারি এই এতদূর এসে
সত্যি শুধু এস্. ওয়াজেদ আলী
সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে!

শঙ্করানন্দ মুখোপাধ্যায়
(১৯৩২)

যিনি গেলেন

যিনি গেলেন তিনিই গেলেন
তাঁকে নিয়ে কারো কোন ভাবনা চিন্তা নেই
তিনি গোপনে যান সামনে দিয়ে যান
কেউ ফিরে তাকায় না তাকাবে না
কেউ চশমা কপালে তুলে আড়চোখে কাঠের আড়াল থেকে
তাঁকে দেখবে না দেখলেও বলবে না
সর্বদাই নিজেকে নিয়ে কি প্রশান্ত খুশি-খুশি ভাব সর্বদাই হিসেবনিকেশ
উনি কি আমার উনি কি তোমার উনি কি ওদের
তিনি পথের কল থেকে এক গণ্ডূষ জল পান করে
নিজেই নিজের পথে চলে গেলেন কেউ জানলো না
পথের কল পথে রইলো
তিনি পথে
পথের নিশ্চিত আহ্বান সকলে শুনবেই
তাঁর জন্যে কারো কোন মাথাব্যথা নেই
সে সব জানেন বলেই তিনি আগেভাগে পা বাড়ালেন।

আলোক সরকার
(১৯৩২)

আমার বাবার গলা

আমার বাবার গলা ঠিক আমার পিছনে
গম্ভীর আর নিচু আর অনায়াস—
আবছা চাঁদের আলোয় গর্তটা লাফিয়ে ডিঙোই।

দূরে কাছে কিছুই দেখা যায় না, কয়েকটা বাবলাগাছ
হঠাৎ হয়ে-ওঠা বট-অশথ।
চাঁদও ক্রমশ নিবে আসছে সোজা চোখে আরো এগিয়ে চলি।

খাল পার হবার আগেই আমার বাবার গলা
ঠিক আমার পিছনে—
বাঁশের সেতুর মাঝখানটা ভাঙা সতর্ক লাফে পার হই।

এখন আর চাঁদ নেই অন্ধকার ঘন-করা জোনাকি
সোজা চোখে আরো এগিয়ে চলি।
সামনেই উঁচু মাটির ঢিবি—চমকে উঠে শুনি

আমার বাবার গলা গম্ভীর আর নিচু
আস্তে আস্তে উঠি উপরে।
জ্বলজ্বলে শেয়ালের চোখ অন্ধকার নাচিয়ে দিয়ে ছুটে যায়।

পূর্ণেন্দু পত্রী
(১৯৩২)

হে স্তন্যদায়িনী

তোমার দুধের মধ্যে এত জল কেন?
তোমার দুধের মধ্যে এত ঘন বিশৃঙ্খলা কেন?

রক্তে-ঝড়ে না ভেজালে
কোনো সুখ দরজা খোলে না।
ময়ূরও নাচে না তাকে দু-নম্বরী সেলামী না দিলে।
হাতুড়ির ঘায়ে না ফাটালে
রাজার ভাঁড়ার থেকে এক মুঠো খুদ খেতে
পায় না চড়ুই।
স্বপ্নে যারা পেয়ে গেছে সচেতন ফাউন্টেনপেন
তাদেরও কলমে দেখ
সূর্যকিরণের মতো কোনো কালি নেই।

হে স্তন্যদায়িনী
তোমার দুধের মধ্যে এত জল কেন?
তোমার দুধের মধ্যে
প্রতিশ্রুত ভাস্কর্যের পাথর কেবল।

তরুণ সান্যাল
(১৯৩২)

বর্ণপরিচয়

দেউড়ির সামনে টুলে মস্ত গোঁফ উর্দি ও নিষেধ
একটি-দুটি নীল বাস উড়ে আসছে, ছুঁয়ে যাচ্ছে
হাওয়ায় শ্যাম্পুর হাল্কা গোলাপ বা ল্যাভেণ্ডার, যুঁই,
এবং স্বর্গের ভাষা জলের উপরে জলপাতে
এবং মার্বেল সিঁড়ি বেয়ে উঠে যাচ্ছে দ্রুত স্যাচেল টিফিন বাক্সে
মায়েদের স্ট্যাটাস সিম্বল হয়ে পরীদের শিশু
বাবাদের আকাঙ্ক্ষা ও ব্যয় হয়ে
ভারতের ভাবী শাসকেরা

দেউড়ির অনেক বাইরে বুকে চেপে ভাঙা শ্লেট, বর্ণপরিচয়
তালিমারা ছেঁড়া প্যান্ট, বুকের বোতামহীন শস্তা শার্ট ঠেলে ওঠা
পাঁজর কণ্ঠায় এক শিশু
এই সব দেবদূতদের দেখে
এই সব ভবিষ্যৎ প্রভু প্রভুপত্নীদের দেখে
চিনে নিচ্ছে বর্ণপরিচয়

প্রাসাদ ও বস্তি নিয়ে
প্রাচুর্য ও ক্ষুধা নিয়ে
দেউড়ির ভিতরে বাইরে বয়ে যাচ্ছে একটাই কলকাতা

খোকা, তোর আরো ঢের মন দিয়ে বর্ণপরিচয় শেখা চাই
খোকা, তোর ভাঙা শ্লেটে, আঁকাবাঁকা অক্ষরের ঢঙে
মহাদেশ মহাসাগরের নক্সা
মহাবিশ্ব সৌরলোক,

ফসলে ও যন্ত্রে, পাখি, নদীর কাকলি নিয়ে
গোটা মানুষের ছবি ফুটে ওঠা চাই
আমার তো চলে গেল ত্রস্ত দিন লাঙলের বাঁটে হাত রেখে
আমার তো বয়ে যায় ভরা বেলা যন্ত্রের পাঞ্জায় হাত রেখে
আমার তো পদপাতে পিচের গরম চুমা
অনাবৃষ্টি, উচ্ছেদ বা ছাঁটাই মিছিলে

খোকা, তোকে জানতে হবে
পৃথিবীটা বদলে দিতে কতখানি ধৈর্য পেতে হয়
খোকা, তোকে আমাদের সময়ের সমুদ্র মন্থন করে
কেশর বাঁহাতে ধরে বশ মানাতে হবে উচ্চৈঃশ্রবা

না, কোনো আপিস-ঘরে টাই-প্যান্টে জরদ্গব দম্ভ নয়
তোকে নিতে হবে এই সসাগরা ধরিত্রীর
কঠিন দায়িত্ব, শান্তি সমৃদ্ধির দায়

এখনি সময়, খোকা, ভালো করে শেখ
এখনি সময়, খোকা, ভালো করে চোখ মেলে দেখ
এখনি সময়, খোকা, তোর বর্ণপরিচয়ে
আমাদের স্বপ্ন, ভাবীকাল॥

সবরমতী

নদীর বালিতে জ্যোৎস্না শান্ত শাদা, নদীর চিকন জলে ছলছল সময়
এমন বিপুল শূন্য স্নিগ্ধতায়, সবরমতী, আছ শুয়ে কোন স্মৃতি বেদনাবিনত?
আমারও অনেক সুখ মুখ থুবড়ে অমনি বালিতে শুয়ে, ধবল নুড়ির বাঁকে
নরকরোটির পুঞ্জে, কঙ্কাল বলয়ে
আমারও অনেক সাধ অমনি চিকনজলে চূর্ণ ফেন-তরঙ্গের ছুরিতে নিহত।

মধ্যরাতে জ্বলে ওঠে দাউদাউ আকাশ, আর্ত নারীর জঙ্ঘায়
তীক্ষ্ণ ধাতব আয়ুধ,
দিনগুলি শকুনের ডানায় শমশম হাওয়া, আরব সমুদ্রে
হা হা লোনাস্ফুর স্ফীতি
আমি শুধু গুণে দিই অন্তরাত্মা, ত্রিশটি রুপার চাকতি এবং শোণিত ধূমে সুদ
নদী, আ রে দূরপ্লাবী মানুষের বেদনার স্রোত, নদী বালি ও প্লাবনে খাঁ খাঁ
হঁ-মুখে হোঁচট খেয়ে পাতাল-পতনে দ্রুত নিয়ে যাও প্রীতি
স্মৃতি, কখন বিস্মৃতি

তিনি যেন এখানে ছিলেন, তাঁর শীর্ণ দেহে জ্বলে উঠত
ভারতবর্ষের অভিমান,
দুঃখ বজ্র হতো —
শূন্য গ্রাম, দগ্ধভাল মাঠে
দিনগুলি দৌড়ে যেত প্রলয়পয়োধি জলে, ইতিহাস দ্রুত
নৌকা, নদী ছলাৎচ্ছলে,
তিনি যেন নদীর পাড়ের ভাঙা মসজিদে আজান, ঊষাউন্মীলনে
লোকচলাচলে শান্তপথ

এখন চশমায় তাঁর ধুলো, কেউ মুছে দেয় না, ট্যাকের ঘড়িটি থেমে আছে
মৃত আমেদাবাদের হৃদপিণ্ডে,
ঐ তিনি গোলাপবিথার থেকে তর্পণে নামেন রাজঘাটে
এবং তাঁরই নদী সবরমতী আ রে অশ্রুমতী লজ্জাহীনা নগ্ন ধর্ষণের
বিকৃত স্বরাটে
মানুষের অপমান বহে যাও—যা কেবল অশ্রু স্বেদ রক্তের
লবণে তপ্ত জল
সূতাকলে বিষাদপ্রতিমা গাঁথে নক্সিকাঁথা দুঃখের সূতায়
নিহত পুরুষ-নারী আগামী ভারত যেন মৃত শিশু দুজনের মধ্যে নিয়ে
নদীর ছলছলে শুয়ে, স্বপ্নের বিভ্রমে নড়ে, কথা কয়
সে-কি তুলে ধরে ঢেউ, আর সমুদ্রবাহী মেঘ,
মেঘে বিদ্যুতে হিম্মত?

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়
(১৯৩২)

নগরীর ক্ষুধিত পলাশে

লজ্জাহীন সিঁথির সিঁদুর যেন চলকে পড়ে গালে অঙ্গবাসে
ভেঙে দুলে শিথিল হাওয়ায় হাসে কৃষ্ণচূড়া এমন বেহায়া,
সেদিন দুপুরে ছিল চৈত্রমাস নগরীর ক্ষুধিত পলাশে
তথাপি কলকাতা ভরে শুয়েছিল শিরিষের ছায়া।

হা-অন্ন মানুষ যেন প্রত্যেকেই বিস্ফারিত বসন্তের জ্বরে
রক্তের কুসুমে ক্ষুব্ধ ফুটে ওঠে রুষ্ট কূট উদ্বেল ফাগুন,
ঘরে যার দাবানল, সে নহে শঙ্কিত পোড়া দগ্ধ চরাচরে;
ধ্বংসের সন্ত্রাস তার হাতে-পোষা প্রথম আগুন।

কবিতা সিংহ
(১৯৩২)

বৃক্ষ

বার বার বৃক্ষই কেবল
বৃক্ষই আমার কাছে ফিরে ফিরে আসে
প্রত্যয়ের মতো
এমন প্রত্যয় আর বৃক্ষশাখা ভিন্ন কোথা রাখি
বৃক্ষই আমার সব
আমার সাবেকি!

আমার জন্মের মধ্যে রয়ে গেছে তরুর ইশারা
বীজ থেকে ক্রমে আমি হাড়ে মাংসে শোণিতে মজ্জায়
চোখে কানে সঞ্চারিত হই
আমি যাই পত্রগুচ্ছের দিকে ফুলে ও পাপড়িতে যাই
বহিরঙ্গে আকাশে বাতাসে

তারপর বীজ ওড়ে আমার নিজের বীজ বাতাসে বাতাসে
আমার কথারা যায় আমি যাই ইচ্ছগুলি যায়
সব যায় দিকে ও বিদিকে

আর তারও পর
আমি ফিরে আসি
নিজেকে সংবৃত করি সংকুচিত একেলা একাকী
বৃক্ষেরই দৃষ্টান্তে ফিরে আসি
বৃক্ষের দৃষ্টান্তে হই একা

বহিরঙ্গ ডেকে ফিরি অন্তরঙ্গে গূঢ় মৃত্তিকায়
বৃক্ষ থেকে শিখে নিই বাহিরে ভিতরে
এইসব মনোময় অঙ্গময় প্রাণময় বাঁচা!

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত
(১৯৩৩)

জন্ম নিল ট্র্যাজিডি

দিয়নুসাস এক কবির হাতে
তুলে দিলেন মদির ডিথিরাম,
জন্ম নিল ট্র্যাজিডি; দিয়নুসাস

ভাবতে থাকেন: 'কাকে যে কী দিলাম,
চেয়েছিলাম আনন্দ ঘটাতে,
উৎসারিত হল দীর্ঘশ্বাস!'

ডিথিরামের স্তবক থেকে আঙুর
নিংড়ে নিয়ে কৌশ জ্যোৎস্নাতে
প্রলয় নাচে মেতেছে নরনারী

সহসা কোন্ বিধুর পুরোহিত
ভ্রূ-যুগ থেকে কী-অভিসম্পাতে
মন্ত্র পড়ে মৃত্যুসঞ্চারী!

তন্বী এক নাচের ঘন ঘোরে
নিজের মধ্যে প্রিয়া ও জননীকে
মেলাতে গিয়ে বক্ষে ও অধরে

তার নিজস্ব সন্তানপ্রতিম
প্রেমিকটিকে জড়াতে গেল যেই
ওরা দুজন গর্তে গেল পড়ে।

দিয়নুসাস নিষ্ক্রিয় দর্শক,
তাঁর হাতের আনন্দের দান
অন্ধকারে এখন তুহিন হিম!

এক উদাসীন পান্থ

অন্ধকার থেকে অন্ধকারে
প্রাণের আনন্দ যাও, প্রাণের আনন্দ,
আমি একা, নাও গো আমারে।

নন্দন পাহাড়ে ঘন রাত।
আলিঙ্গনরত বৃক্ষ, আশ্লেষে অনন্ত,
অনন্তের একখানি হাত
পাহাড়ের গ্রীবা নত করে।
পাহাড়ী তমাল থেকে নন্দিত বেদনা ছোটে।
আর এই রাত্রি দ্বিপ্রহরে

রেলপথে আবছা কার মুখ
দেখে জেগে উঠল যাত্রী এক, তার বক্ষে লোটে
এঞ্জিনের দারুণ ধুক ধুক।
ওর কোনো শঙ্কা নেই, ওর
স্বপ্নে যে এসেছে তার জয় হবে, নিরাকারা
এ-রাত্রি হবেই হবে ভোর।

প্রত্যাশিত সেই ভোর হলে
স্বপ্নের অলীক দরজা ভেঙে সত্যে দেবে সাড়া,
ওর মাথা তুলে নেবে কোলে

সে-ও তো ঈশ্বরী, তার দু'পা
অন্ধকারে দেখা যায় না, বাতাসের মন্ত্রণায়
সে এখনো আঁধারে অরূপা;
রাত্রির তিমিরে প্রণয়ীকে
ভয় করে বলে তাই বার বার ভয় দেখায়—
এই ভাবে এদিকে ঐদিকে
একদিকে সুখ অন্য ধারে
অপেক্ষা চিহ্নিত ক'রে প্রাণের আনন্দ,
আমায় দিয়েছ তুমি কারে?

আমাকে আমার প্রেমিকারে
নিঃশব্দে চিনিয়ে দিয়ে এক উদাসীন পান্থ
উঠে গেল নন্দন পাহাড়ে॥

শ্যামসুন্দর দে
(১৯৩৩)

সোনার হরিণ

সারাদিন সারাদিন হয়রান, সোনার সন্ধানে,
সারাদিন থিক্‌থিকে মৃত সাবর্জনা মাখা নর্দমায়
জঞ্জালের গন্ধে আর পাঁকে
সোনা খোঁজে ওরা।
কী প্রখর চোখের সন্ধান
যেন প্রতি ধুলোর কণায় আছে, সোনার ঠিকানা!
গয়নার দোকানের সামনে নর্দমায়
হাপিত্যেশ জন্যে নোংরা জলে।
ওরা তাই সারাদিন
রোদ বৃষ্টি ঝড়েতে ঋতুতে সারাদিন
অনিশ্চিত আশায় আশায়
স্বর্ণ পিপাসায়
ধনুকের মতো পিঠে...... নালি ঝাঁঝরির মুখে মুখ
গায়ে পাঁক কলঙ্ক কর্দমে
ঝুড়ির ভিতরে জল ফেলে জল ছাঁকে
যদি ওঠে তিলোত্তমা স্বর্ণরেণু রাশি
তিলে তিলে গুঁড়ো গুঁড়ো স্বপ্ন দিয়ে গড়া
লোভী আর চক্‌চকে সোনার পাহাড়।
সারাদিন সারাদিন পাঁকধুলো
ময়লা লাগা উদোম শরীরে
সোনার কামনা জ্বেলে রৌদ্রকেই করে সবহেলা।
ওধারে কখন নীল আকাশের সূর্যাস্তে বিশাল

সোনার সমুদ্র ঢেউ দেয় ব্যাপ্ত সান্ধ্য সীমানায়
কখন সূর্যের কাজ শেষ করে স্বর্ণকারিগর
সমস্ত দিগন্ত জুড়ে নেমে যায় পাটে।
রাত্রে ওঠে হলুদ সোনালী মস্ত চাঁদ
রাতের নীলিমা ভরা সোনার থালায়
নাচে যেন সোনার হরিণ মুগ্ধছন্দে স্বাভাবিক।
ওরা কেন এখনও জানেনা—
আকালে আকালে মাঠে রৌদ্রে জ্যোৎস্নায়
জীবনে সংগ্রামে যারা রক্ত জমা দেয়
তাদেরই রয়েছে অধিকারে
বিশ্ব পৃথিবীর যত সোনা মাটি সোনা।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়
(১৯৩৪)

অবনী বাড়ি আছো?

দুয়ার এঁটে ঘুমিয়ে আছে পাড়া
কেবল শুনি রাতের কড়ানাড়া
'অবনী বাড়ি আছো?'

বৃষ্টি পড়ে এখানে বারোমাস
এখানে মেঘ গাভীর মতো চরে
পরাঙ্মুখ সবুজ নালিঘাস
দুয়ার চেপে ধরে—
'অবনী বাড়ি আছো?'

আধেকলীন হৃদয়ে দূরগামী
ব্যথার মাঝে ঘুমিয়ে পড়ি আমি
সহসা শুনি রাতের কড়ানাড়া
'অবনী বাড়ি আছো?'

একবার তুমি

একবার তুমি ভালোবাসতে চেষ্টা করো—
দেখবে, নদীর ভিতরে, মাছের বুক থেকে পাথর ঝরে পড়ছে
পাথর পাথর পাথর আর নদী-সমুদ্রের জল
নীল পাথর লাল হচ্ছে, লাল পাথর নীল
একবার তুমি ভালোবাসতে চেষ্টা করো।

বুকের ভেতর কিছু পাথর থাকা ভালো—ধ্বনি দিলে প্রতিধ্বনি
পাওয়া যায়
সমস্ত পায়ে-হাঁটা পথই যখন পিচ্ছিল, তখন ঐ পাথরের পাল
একের পর এক বিছিয়ে
যেন কবিতার নগ্ন ব্যবহার, যেন ঢেউ, যেন কুমোরটুলির
সলমা-চুমকি-জরি-মাখা প্রতিমা
বহুদূর হেমন্তের পাঁশুটে নক্ষত্রের দরোজা পর্যন্ত দেখে আসতে পারি।

বুকের ভিতরে কিছু পাথর থাকা ভালো
চিঠি-পত্রের বাক্স বলতে তো কিছুই নেই—পাথরের ফাঁক-ফোকরে
রেখে এলেই কাজ হাসিল—
অনেক সময় তো ঘর গড়তেও মন চায়।

মাছের বুকের পাথর ক্রমেই আমাদের বুকে এসে জায়গা করে নিচ্ছে
আমাদের সবই দরকার। আমরা ঘরবাড়ি গড়বো—সভ্যতার একটা
স্থায়ী স্তম্ভ তুলে ধরবো।
রুপোলি মাছ, পাথর ঝরাতে-ঝরাতে চলে গেলে
একবার তুমি ভালোবাসতে চেষ্টা করো।

যেতে পারি, কিন্তু কেন যাব?

ভাবছি; ঘুরে দাঁড়ানোই ভালো।

এত কালো মেখেছি দু হাতে
এত কাল ধরে।
কখনো তোমার ক'রে, তোমাকে ভাবিনি।

এখন যাদের পাশে রাত্তিরে দাঁড়ালে
চাঁদ ডাকে: আয় আয় আয়

এখন গঙ্গার তীরে ঘুমন্ত দাঁড়ালে
চিতাকাঠ ডাকে: আয় আয়

যেতে পারি
যে-কোনো দিকেই আমি চলে যেতে পারি
কিন্তু, কেন যাবো?

সন্তানের মুখ ধরে একটি চুমো খাবো

যাবো
কিন্তু, এখনি যাবো না
তোমাদেরও সঙ্গে নিয়ে যাবো
একাকী যাবো না অসময়ে॥

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
(১৯৩৪)

কেউ কথা রাখেনি

কেউ কথা রাখেনি, তেত্রিশ বছর কাটলো, কেউ কথা রাখেনি
ছেলেবেলায় এক বোষ্টুমি তার আগমনী গান হঠাৎ থামিয়ে বলেছিল
শুক্লা দ্বাদশীর দিন অন্তরাটুকু শুনিয়ে যাবে।
তারপর কত চন্দ্রভুক অমাবস্যা চলে গেল কিন্তু সেই বোষ্টুমি
আর এলো না
পঁচিশ বছর প্রতীক্ষায় আছি।

মামাবাড়ির মাঝি নাদের আলি বলেছিল, বড় হও দাদাঠাকুর
তোমাকে আমি তিনপ্রহরের বিল দেখাতে নিয়ে যাবো
সেখানে পদ্মফুলের মাথায় সাপ আর ভ্রমর
খেলা করে!
নাদের আলি, আমি আর কত বড় হবো? আমার মাথা এই ঘরের ছাদ
ফুঁড়ে আকাশ স্পর্শ করলে তারপর তুমি আমায়
তিনপ্রহরের বিল দেখাবে?

একটাও রয়্যাল গুলি কিনতে পারিনি কখনো
লাঠি-লজেন্স দেখিয়ে দেখিয়ে চুষেছে লস্করবাড়ির ছেলেরা
ভিখারীর মতন চৌধুরীদের গেটে দাঁড়িয়ে দেখেছি
ভিতরে রাস-উৎসব
অবিরল রঙের ধারার মধ্যে সুবর্ণ কঙ্কণ-পরা ফর্সা রমণীরা
কত রকম আমোদে হেসেছে
আমার দিকে তারা ফিরেও চায়নি!

বাবা আমার কাঁধ ছুঁয়ে বলেছিলেন, দেখিস, একদিন আমরাও…
বাবা এখন অন্ধ, আমাদের দেখা হয়নি কিছুই
সেই রয়্যাল গুলি, সেই লাঠি-লজেন্স, সেই রাস-উৎসব
আমায় কেউ ফিরিয়ে দেবে না!

বুকের মধ্যে সুগন্ধি রুমাল রেখে বরুণা বলেছিল,
যেদিন আমায় সত্যিকারের ভালোবাসবে
সেদিন আমার বুকেও এ-রকম আতরের গন্ধ হবে!
ভালোবাসার জন্য আমি হাতের মুঠোয় প্রাণ নিয়েছি
দুরন্ত ষাঁড়ের চোখে বেঁধেছি লাল কাপড়
বিশ্বসংসার তন্ন তন্ন করে খুঁজে এনেছি ১০৮টা নীলপদ্ম
তবু কথা রাখেনি বরুণা, এখন তার বুকে শুধুই মাংসের গন্ধ
এখনো সে যে-কোনো নারী!
কেউ কথা রাখেনি, তেত্রিশ বছর কাটলো, কেউ কথা রাখে না!

স্মৃতির শহরে—১৫

একদিন কেউ এসে বলবে
তোমার বসবার ঘরে একটা চৌকি পাতবার জায়গা আছে
আমি ঐখানে আমার খাটিয়া এনে শোবো
আমার গাছতলা আর ভাল্লাগে না!

একদিন কেউ এসে বলবে
তোমার ভাতের থালা থেকে আমি তিন গ্রাস তুলে নেবো
কারণ আমার কোনো থালাই নেই
আমার অনাহার একঘেয়েমির মতন ধিক্‌ধিক্ করে জ্বলছে
আর আমার ভাল্লাগে না!

গাড়িবারান্দার তলা থেকে ধুলো মাখা তিনটে বাচ্চা ছুটে এসে বলবে
ওগো, আমরা বাসি রুটি চাই না, পাঁচ নয়া চাই না

আমাদের ছাই রঙের হাফ প্যান্ট আর সাদা শার্ট পরিয়ে
চুল আঁচড়ে দাও
আমাদের গাল টিপে দিয়ে বলো, সাবধানে—
আমরাও ইস্কুলে যাবো!

একদিন কয়লাখনির অন্ধকার থেকে উঠে আসবে
একজন কালো রঙের মানুষ
সে অবাক হয়ে বলবে
একি, আমার জন্য শোকসভা নেই কেন?
ডিনামাইট নিয়ে আমি গিয়েছিলুম গভীর থেকে আরও গভীরে
আমি ফিরিনি, কিন্তু তোমাদের জন্য আগুন এসেছে
আমার নামে তোমরা কেন নাম রাখো নি শহরের রাস্তার
তবে এসব রাস্তা কাদের নামে, তাদের তো চিনি না।

একদিন ধানখেতে কাদা জল মেখে দাঁড়ানো একজন মানুষ
নিজের চেয়ে আরও অনেক লম্বা হয়ে উঠে গলা তুলে বলবে,
তোমরা যারা কোনোদিন কাদা জল মাখোনি
মাটিতে শোনোনি কোনো আওয়াজ
জানো না ঘাম-রক্ত-উৎকণ্ঠায় সবুজ হয় সোনালি
সেই তোমরাই শস্য নিয়ে রাহাজানি করো
আর আমার সন্তানরা থাকে উপবাসী, তোমাদের লজ্জা করে না?
আমি আসছি......।

বন্দি, জেগে আছো?

চরাচরে অন্ধকার, নিঃশব্দ নিশীথে ডাক ওঠে:
বন্দি, জেগে আছো?
বন্দি কি ঘুমোয়? না কি জাগরণই তার বন্দিশালা
মাথার ভিতর জ্বালা যাবজ্জীবন পল অনুপল

পদক্ষেপে শিকলের শব্দ—তার নিঃসঙ্গতা, অন্ধকুঠুরির
ভিতরে স্বপ্নের মতো রোদ এসে
জানায় অস্তিত্ব, এ কি নিষ্ঠুরতা—যে রয়েছে চিরকাল
জেগে, তাকে প্রশ্ন
বন্দি, জেগে আছো?

যে রয়েছে চিরকাল জেগে তার হিংস্র কঠিন মুখ
গরাদের ফাঁকে চেয়ে থাকে, তবু কপালের নিচে
প্রশ্নের জ্বলন্ত দুই শর;
সমূহ প্রকৃতি থেকে যে-রয়েছে দূরে তার আঁধারে ঝলসানো চোখ
প্রেমের নিভৃত শিল্পে, পণ্যে, পিপাসায়, লোভে
অত্যন্ত ঘুমন্ত সব মানুষের খেলাঘরে
প্রতিপ্রশ্ন ছুঁড়ে দেয়;
স্বাধীন? স্বাধীন?

সাধনা মুখোপাধ্যায়

(১৯৩৪)

পরজন্ম

তখন খিড়কি পুকুরের ধারে
রিঠে দিয়ে মাথা ঘষতে ঘষতে
মেয়ে-ঝিরা স্নান করত
কলকাতায় বাসা ভাড়া নিয়ে থাকা
সোয়ামির গল্প করত বউটি
গামছা দিয়ে স্বাস্থ্য—দীঘল
চিকণ চুলের গোছা ঝাড়তে ঝাড়তে
গর্ব করে বলত
লোকটা দুটো পাশ দিয়েছে তো
সায়েবদের সঙ্গে গড় গড় করে
ইন্‌জিরিতে কথা বলে
ওকে সবাই খুব মান্যিগন্যি করে
এবারে বলে দিয়েছি
পুজোয় আমার জন্যে গন্ধতেল
পমেটম আর তরল আলতা আনতে
বিলিতি সাবানও চাই একখানা
স্বামী-সোহাগিনীর বুকের খাড়াই
আর মুখের জ্যোতি যেন ফেটে পড়ত
পাশে পুকুরের ছ্যাত্‌লা ধরা সিঁড়িতে বসে
জলের মধ্যে পা দোলাতে দোলাতে
তের বছরের বিধবা বালিকাটি
সুখ-স্বপ্ন দেখত

পরজন্মে আমার যেন অমন একটা
সোয়ামি ভাগ্য হয়
পাই যেন সাবান তেল আলতা পমেটম
সাত জন্মের রুক্ষু চুল যেন একটু
গন্ধ তেলের স্পর্শ পায়।

রবীন সুর
(১৯৩৪)

কবি

তিনিই কবি যাঁর পিঠে চাবুকের দাগ থাকে না

তিনি পীড়িতদের গান শোনান আর মেহনতের লবণাক্ত ঘাম
শুকিয়ে দেন অয়নান্তে রুটি চিবোনো শক্ত চোয়ালের
সমস্ত মানুষের
মাইল মাইল ব্যাপ্ত তালপাতার দয়ালু পাখায়

এক অর্থে তিনি সৈনিক

যুদ্ধের সময় একদল মানুষ আর-একদল মানুষকে
খুন করার জন্য মুখিয়ে ওঠে
আর কবির যুদ্ধ
মানুষের-বিরুদ্ধে-যা-কিছু আবহমানের তার বিরোধিতায়

একটা গাছ জন্মসূত্রেই গাছ
একটা পশু স্বাভাবিক ভাবেই পশু
একটা পাখি সহজেই পাখি
কিন্তু অনেক চেষ্টা চেতনায় জাগরণে মানুষ—মানুষ

এই চেষ্টা চেতনা জাগরণের জন্যেই কবির যুদ্ধ

যে বেঁচে থাকায় বঞ্চনার বিষ
যে জীবন জীবন্ত নয়
যে পৃথিবী সুন্দর করার জন্য এতদিন আমরা
পূজা করে আসছি নামাবলি কমণ্ডলু ধূপধুনা ব্যতিরেকে
তিনি সেই পূজার পুরোহিত

তাঁর গলায় শেকলের দাগ নেই!

কবিরুল ইসলাম
(১৯৩৪)

সমস্তই স্মৃতি হ'য়ে যায়

সমস্তই স্মৃতি হ'য়ে যায়:
কাল আজ এবং আগামীকাল সবই
বস্তুত যা কিছু বর্তমান
সমস্তই একদিন স্মৃতি হ'য়ে যায়।

স্মৃতি বড় প্রিয় বস্তু যেমন আত্মজা
হে আমার প্রিয় প্রতিনিধি,
আমার বাগানে এত কলকণ্ঠ হাওয়া:
ভিন্ন ভিন্ন ফুল পাখি অভিন্ন হৃদয়
সূর্যোদয় সূর্যাস্তের ডালে
আলোর সংবাদ আনে: আলোরই প্রস্তুতি
অন্ধকারে রাত্রির বিশ্রামে—
উজ্জ্বল সকাল।

স্মৃতির দর্পণ যেন গোষ্পদে আকাশ!

স্মৃতির বয়স নেই অতএব স্মৃতির শরীরে
জরা নেই। স্থান কাল পাত্র নেই। সমস্ত সময়
হৃদয়ে লালিত লগ্ন যৌবনের মতো
নির্ভার উর্বর।

যে যায় সে যায় তাকে স্মৃতির পাহারা
বুকে তুলে রেখে দেয় যেমন জননী
এবং সস্নেহে

সমস্ত শরীরে তার বুলায় দু'হাত
স্মৃতি বড় প্রিয় বস্তু, হে আমার সন্তান সন্ততি,
রক্তের মুকুট,
স্বরচিত দ্বিতীয় ভুবনে
হে আমার রক্তের গোলাপ!

যেহেতু যা কিছু বর্তমান
সমস্তই একদিন স্মৃতি হ'য়ে যায়,
তুমি আমি অনিবার্য নীল ঢেউএ ঢেউএ
স্মৃতির বাসরে চলে যাবো।

এবং স্মৃতিতে আমি বেঁচে থাকবো সম্রাটের মতো।।

শিবশম্ভু পাল
(১৯৩৪)

দ্বিতীয় বিবাহ

বাসর রাত্রেই যুবা বিবাহ বিচ্ছিন্ন হয়েছিল।

সে বোঝেনি নবোঢ়ার চোখের কাজলে অসময়....
অলকাতিলক থেকে জবরদখল সিঁদুরের
রক্তসীমা ভেঙে দিয়ে সুতাশঙ্খ চেরাজিভ নিয়ে
সোহাগ-উদ্যত সেই অধিকারে ছোবল দিয়েই
চলে গেছে অগস্ত্যযাত্রায়।

গুণিন বাঁচিয়ে দিল রোদ্দুর ছিটিয়ে আর খবরের কাগজের হেডিং শুনিয়ে।

তারপর থেকে দু-বছর
আঙুরবিরোধী হয়ে সেই যুবা জেনে বা না জেনে
চাঁদকে বলেছে কাস্তে, কখনো বা ঝলসানো রুটি।
দু-বছর মাছমাংস পেঁয়াজ রসুন মশলা না ছুঁয়ে, তেল না মেখে
পাথর ভাঙার জোর প্রতিযোগিতায়
নিজের দুখানা হাত করে তুলল হেঁতালের লাঠি।

কালাশৌচ কেটে গেলে কাগজে সে দিল বিজ্ঞাপন
ডিভোর্সি পাত্রের জন্যে সবর্ণ কি অসবর্ণ পাত্রী চাই,
দাবি দাওয়া নেই।

দ্বিতীয় বিবাহে সেই দুবছর আগেকার বধূটিই ফিরে এসেছিল।

বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত
(১৯৩৪)

মৃত ছায়ার সৈকতে

না, বন্ধু, প্রেমিক হতে পারিনি এখনো।

এমন কি পাগল কিংবা দৃশ্যমান মুগ্ধ প্রকৃতির
নিজস্ব সংবাদদাতা! যদিও একদা
নিরীহ রৌদ্রের মধ্যে আকাশের সমস্ত সত্তাকে
দু'চোখে রেখেছিলাম আকাঙ্ক্ষার চিহ্ন দিয়ে ভ'রে;
আজ অবশ্য এই মৃত ছায়ার সৈকত
তাকে আর দেখেও দেখে না!
আজ-বসি বাহিরের বিশাল সমুদ্রে উন্মোচিত
বিদেশি তরঙ্গ, যার অস্পষ্ট আঘাতে, আলোড়ন;
রক্তের গোপন মন্ত্রে প্রতিদিন পথিক-হৃদয়
এক দিগন্তের থেকে অন্য দিগন্তের দিকে চলে,
আর এই অনাত্মীয় ঘরের নিভৃত অভিলাষ,
যা কিনা করুণ, আর ছায়াছন্ন, আর অবিশ্বাসী,
জ্বলন্ত অঙ্গার হয়ে আজ তারই জন্য জ্বলবে এসো!

সেই ভালো; কিন্তু তার বেশি ভালো নয়।

যা ছিলো, সবাই তাকে স্মৃতি বলে, যেহেতু তা মৃত;
এবং, যা নেই, কিংবা কোনোদিন ছিলো না কোথাও—
অথচ দুঃখের মতো, আনন্দের আলোর মতন
পৃথিবীর রৌদ্রে আর রক্তে মিশে যা আজো নিহিত,

পবিত্র আগুনে তার মুখ দেখবে এসো,
এসো তুমি অসম্পূর্ণ, নিষ্প্রভ মানুষ!
কেউই তো এলো না!—দ্যাখো, দৃশ্যপটে বিপরীত আলো;
তোমার ঘনিষ্ঠ গলা কাকে ডেকে ব্যর্থ হলো, দ্যাখো।
যেমন দাঁড়িয়েছিলো পুরোনো মন্দির বাড়িঘর,
এবং সবুজ গাছ, দুটো-একটা পাখি, আর নিঃসঙ্গ আকাশ,
সবই রইলো একাকার হয়ে এই ছায়ার সৈকতে।

কিন্তু, সে এলো না।

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত
(১৯৩৫)

এসো, আরো একবার চেষ্টা করি

'রাত্রি' শব্দটিকে লিখে তৎক্ষণাৎ কেটে দিই!
জ্যোৎস্না লিখবো, জনতাকে নক্ষত্র চেনাবো
ভেবেই শব্দটি প্রথম লিখেছিলাম। এই
বোবা স্বাধীনতার স্বদেশে এখন কেউই আর স্পষ্ট জেগে নেই
শুধু টেলিপ্রিন্টারের গম্ভীর গুঞ্জনে বোঝা যায়
দুঃসংবাদ-দুঃখী এক মেধাবী মেশিন জেগে আছে।
বন্যা, খরা, গরীব-মুদ্রার দেশে তহবিল তছরুপ
মেশিনকে ঘুমাতে দিচ্ছে না।
মানুষের কণ্ঠে কিন্তু এমন নিপুণ বর্ণনার কথা ভাবাই যায় না,
তারা পরিকল্পনা করে, ভাত খাওয়ার আগে ও পরে জল খায়
আয়ুর গরিষ্ঠকাল নারীর প্রাপ্তবয়স্ক তিমিরে চায় কেবলি ঘুমাতে
কমিটি-মিটিং থেকে কাকে বাদ দেওয়া যায়
কাকে উপহার দেওয়া যায় বিনাবিচার কংস কারাগার
সেই শনি কথা, নিজস্ব আঁধারে বসে মানুষই ভেবেছে।
'রাত্রি' মানেই অন্ধকার 'রাত্রি' পৃথিবীর সনাতন কালো
শব্দটি লিখেই তাই কেটে দেওয়া হ'লো।

কবিরা উপমা সংগ্রহ করেছিল চাঁদ থেকে, তারা থেকে
তুলসীতলায় ঘোমটা পরা অনবদ্য আলো থেকে
আজ সব শেষ, শঙ্খের সমুদ্রধ্বনি এখন আর সহরে বাজেনা
সহরে কি দেশ থাকে?
গ্রাম কেন তবে সহরকে আক্রমণ করছে না?

এখনই 'রাত্রি' কেটে 'সূর্য' শব্দটি আমি স্পষ্ট লিখতে চাই
যেন জবাকুসুমসঙ্কাশের আগেই স্বদেশ জেগে ওঠে, চাই
প্রত্যেকে দেখুক চেয়ে মানচিত্র ভরে উঠছে আবার
জনগণমনযুক্ত স্বাধীনতায়।
হায় 'স্বাধীনতা' তুমি কোনো অভিধানবাধ্য বাসীশব্দ নও,
নও গণপার্লামেন্ট, নও
বারুদের বোকা হাহাকার।

এসো আরো একবার চেষ্টা করি 'সূর্য শব্দটি লিখেই
চিৎকার করে বলি—হে নীল এলাকার আলো
তুমি গাঢ় গাছ দাও প্রত্যাবর্তনপ্রিয় পাখি দাও
এমনকি রমণী-নিমগ্ন কবিকেও কিছু অব্যবহৃত উপমা পাঠাও,
কিন্তু তার আগেই চেনাও, কোন মুখে প্রকৃত মানব আছে
কোন মুখে প্রাকৃত মুখোশ।

প্রেম ভাল, তার আগে ভাল দেশপ্রেম, রমণী শেখার আগে
মানুষতো চিরকাল জননীকেই প্রথম শিখেছে।

বিনয় মজুমদার
(১৯৩৫)

এ জীবন

পৃথিবীর ঘাস, মাটি, মানুষ, পশু ও পাখি—সবার জীবনী লেখা হলে
আমার একার আর আলাদা জীবনী লেখা না হলেও চ'লে যেত বেশ।
আমার সকল ব্যথা প্রস্তাব প্রয়াস তবু সবই লিপিবদ্ধ থেকে যেত।
তার মানে মানুষের, বস্তুদের, প্রাণীদের জীবন প্রকৃতপক্ষে পৃথক পৃথক
অসংখ্য জীবন নয়, সব একত্রিত হয়ে একটি জীবন মোটে; ফলে
আমি যে আলেখ্য আঁকি তা বিশ্বের সকলের যৌথ সৃষ্টি এই সব ছবি।
বল্কলে আঙুল রেখে আমি বলি 'এ কী বলো' এবং উত্তর পাই 'গাছ'।
পাতায় আঙুল রেখে আমি বলি 'এ কী বলো' তখন উত্তর পাই 'গাছ'।
শিকড়ে আঙুল রেখে আমি বলি 'এ কী বলো' তবুও উত্তর পাই 'গাছ'।
কুসুমে আঙুল রেখে আমি বলি 'এ কী বলো' এবারো উত্তর পাই 'গাছ'।
তা সত্ত্বেও পৃথিবীতে অত্যন্ত বিশিষ্ট ব'লে ফুলকে পৃথক ক'রে ভাবি—
প্রণয়িনী ফুল বলি, এ রীতিও রয়ে গেছে; প্রকৃতিতে ব্যক্তি আছে,
ব্যক্তিপূজা আছে।
জীবন ফুরিয়ে এল, এইসব কথা জেনে খ্যাতি তৃপ্তি প্রণয়ের সেঁক
চেয়ে চেয়ে শালবনে বাঁশবনে এ জীবন কাটিয়ে দিয়েছি।

অমিতাভ দাশগুপ্ত
(১৯৩৫)

আমার নাম ভারতবর্ষ

স্টেনগানের বুলেটে বুলেটে
আমার ঝাঁঝরা বুকের ওপর ফুটে উঠেছে যে মানচিত্র —
তার নাম ভারতবর্ষ।

আমার প্রতিটি রক্তের ফোঁটা দিয়ে
চা-বাগিচায় কফি খেতে,
কয়লা-খাদানে, পাহাড়ে-অরণ্যে
লেখা হয়েছে যে ভালোবাসা—
তার নাম ভারতবর্ষ।

আমার অশ্রুর জলসেচে আর হাড়ের ফসফেট-এ
খুনীর চেয়েও রুক্ষ কঠোর মাটিতে
বোনা হয়েছে যে—অন্তহীন ধান ও গানের স্বপ্ন—
তার নাম ভারতবর্ষ।

আমার ঠাণ্ডা মুখের ওপর
এখন গাঢ় হয়ে জমে আছে
ভাক্‌রা নাঙালের পাথুরে বাঁধের গম্ভীর ছায়া।
ডিগবয়ের বুক থেকে
মায়ের দুধের মত উঠে আসা তেলে ভেসে যাচ্ছে
আমার সারা শরীর।
কপাল থেকে দাঙ্গার রক্ত মুছে ফেলে

আমাকে বুকে করে তুলে নিতে এসেছে
আমেদাবাদের সুতোকলের জঙ্গী মজুর।
আমার মৃতদেহের পাহারদার আজ
প্রতিটি হালবহনকারী বলরাম।
প্রতিটি ধর্ষিতা আদিবাসী যুবতীর
শোক নয় ক্রোধের আগুনে
দাউ দাউ জ্বলে যাচ্ছে আমার শেষ শয্যা।

ভরাট গর্তের মত
আকাশে আকাশে কেঁপে উঠছে মেঘ।
বৃষ্টি আসবে।
ঘাতকের স্টেনগান আর আমার মাঝবরাবর
ঝরে যাবে বরফ-গলা গঙ্গোত্রী।

আর একটু পরেই প্রতিটি মরা খাল-বিল-পুকুর
কানায় কানায় ভরে উঠবে আমার মায়ের চোখের মত।
প্রতিটি পাথর ঢেকে যাবে উদ্ভিদের সবুজ চুম্বনে।
ওড়িশির ছন্দে ভারতনাট্যমের মুদ্রায়
সাঁওতালি মাদলে আর ভাঙরার আলোড়নে
জেগে উঠবে তুমুল উৎসবের রাত।
সেই রাতে
সেই তারায় তাবায় ফেটে পড়া মেহ্‌ফিলের রাতে
তোমরা ভুলে যেও না আমাকে
যার ছেঁড়া হাত, ফাঁসা জঠর, উপড়ে আনা কল্‌জে,
ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু, রক্ত, ঘাম
মাইল-মাইল অভিমান আর ভালোবাসার নাম

স্বদেশ

স্বাধীনতা

ভারতবর্ষ।।

কাঠের চেয়ার

কাঠের চেয়ারে বসে থাকতে থাকতে
মানুষও একদিন কাঠ হয়ে যায়।
তার পায়ের আঙুলগুলো
শিকড় হয়ে চারিয়ে যায় মেঝের ভেতর।
তার কোমর থেকে
সোঁদরি, গরান, গঁদের আঠা ঝরতে ঝরতে
একদিন তাকে পুরোপুরি এঁটে ধরে তক্তার সঙ্গে।
কুরকুর......কুরকুর
ঘুণপোকা ঘুরতে থাকে তার আশিরনখর,
কাঠের চেয়ারে বসে থাকতে থাকতে
একদিন পুরোপুরি কাঠ হয়ে যায় সে।

তখন
কেউ তাকে চড় মেরে চলে যায়।
সে রাগে না।
সমর্পণ নিয়ে নারী এসে কাছে দাঁড়ায়।
সে কেঁপে ওঠে না।
টালমাটাল পায়ে শিশু ছুটে আসে।
সে দুহাত বাড়িয়ে দেয় না।
একটার পর একটা কাঠ জুড়তে জুড়তে
সে এমন এক কাঠের চেয়ার এখন,
যার শরীরের সন্ধিতে সন্ধিতে শুধু
জং-ধরা পেরেকের গান
ঘুরঘুর ঘুণপোকার গান
একটানা করাত চেরাইয়ের গান।

যে-হাত একদিন সমুদ্র শাসন করত,
তা এখন চেয়ারের দুই ভারী হাতল।
যার দুই উরুতে একদিন

টগবগ করত একজোড়া বাদামী ঘোড়া
আজ আর ডান পা কেটে নিলে
বাঁ পা জানতে পাবে না।
কাঠের অশ্রু নেই স্বপ্ন নেই নিদ্রা নেই হাহাকার নেই;
একটু কষ্ট করলেই
জানালায় দাঁড়িয়ে সে দেখতে পেত
ঢ্যাঙা কালো বেঁটে মাঝারি
উটের মতো পরিশ্রমী
মানুষ মানুষ আর মানুষ।
কিন্তু কাঠের চেয়ারের এই হল মুশকিল
সে জানলা অব্দি হেঁটে গিয়ে দাঁড়াতে পারে না।

শুধু
কাঠের ভেতর লোহার পেরেক আঁটা
তার দুটো চোখ
বাকি জীবনভর
ছোট চেয়ার থেকে মেজ চেয়ার
মেজ চেয়ার থেকে বড় চেয়ার
হওয়ার স্বপ্ন দেখতে থাকে।

মানস রায়চৌধুরী
(১৯৩৫)

অন্ধকারে

পাথরে আচ্ছন্ন রাত্রি। বাতাসে শ্রবণ তুমি রাখো অন্যমন
শুনতে পাবে, কে যেন বলছে মগ্ন এক রূপকথা।
'পৃথিবীর শূন্য সব বাগানের অধ্রুব শাখায়
সেই জাদুকর এসে মায়ামন্ত্রে ফোটায় কুসুম।
ঘুম ভেঙে তুমি আমি দেখতে পাই শিশিরে আলোতে
দিগন্ত আচ্ছন্ন আর গায়ক পাখিরা স্বচ্ছতায়
গান গাইছে। কী আশ্চর্য শূন্যের উদ্যানে।'
ধাতুতে মুদ্রিত রাত্রি। কান রাখো নির্জন বাতাসে
শুনতে পাবে বহু শব্দ, সামুদ্রিক নীল অস্পষ্টতা
দ্রাঘিমা রেখাকে ছিঁড়ে ভেসে আসবে রহস্যনিবিড় ধ্বনিরাশি...
কার শঙ্খ? কার কণ্ঠ? জনহীন ছায়াময় দীর্ঘ বালিয়াড়ি
তিমির লাঞ্ছিত সিন্ধু পার হয়ে কলোচ্ছ্বাস আসে,
বায়ব তরঙ্গে কাঁপে বুঝি কোন অনিদ্রিত অলৌকিক বীণা?

প্রতিবেশ নিরুত্তর, অন্ধকার তেমনি সমাহিত।

২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৮

উৎপলকুমার বসু
(১৯৩৬)

ধূলিয়ান, ১৯৮২

লিখছি বহু দূর থেকে রুইদাসকে আজ দেখেছিলাম সে দৌড়ে আসছে
তার পায়ের নিচে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে অসংখ্য গেঁড়ি-গুগলি
বর্ষার জল ঘোলা হয়ে উঠেছে
কেননা সে ক্রমাগত লাথি মারছে জলে-ডাঙায়
মাটি ধসে পড়ছে
আমাদের এই ছোটো খড়ের ঘর কাঁপছে
বাদলা দিনে কেনাকাটার লোক নেই
সামনের দরজা বন্ধ করে দিয়েছি
মেঘের আড়ালে এ-ভাবেই প্রত্যেকটা দোকান চিহ্নিত হয়
বৃষ্টির ফোঁটা লাগলেই হারিকেনের কাঁচ ফাটে
কাঁচের উপর দিয়ে জল ভেসে চলে
মানুষের মাথা সমান উঁচু।

প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়

(১৯৩৬)

চক্ররেলে একদিন

কেউ কেউ যাচ্ছে, তাই মনে হয়, নিজেও চলেছি

স্টেশনে সমান্তরাল দুটি ট্রেন দাঁড়ালে যেভাবে
পাশের গাড়ির
সহসা সচল গতি অলীকের বিভ্রম জাগায়,
খণ্ড মুহূর্তের জন্য স্থাণু যাত্রী ভুল করে ভাবে
বুঝি তারই যাত্রার সূচনা,
কেটে যাচ্ছে দিনরাত্রি অনেকটাই সেভাবে এখন।
জানি না কোথায়, তবু, মনে হয়, কোথাও চলেছি।

অথচ গন্তব্য একটা ছিল কোনোদিন।
এখনও মনের মধ্যে গুমরে ওঠে অস্পষ্ট ঠিকানা।
রেল-লাইনের ধারে সারি সারি ঝুপড়ির ভিতরে
জ্যান্তমৃত মানুষের অক্ষয় সংসার দেখে আজও
বিস্ময় কাটে না। আজও নির্বাস শিশুর
ধোঁয়ায় রহস্যময় উদ্ভাসিত আননে কীভাবে
ফুটন্ত ভাতের তীব্র সুবাস ছড়িয়ে যেতে থাকে—
চেয়ে চেয়ে দেখি।
দেখি আর নাসারন্ধ্র ভরে
একুশ শতকে দ্রুত ধাবমান ভারতবর্ষের
গন্ধ নিতে চাই, দুই চক্ষু ভরে আঁকতে চাই ছবি।

এবং তখনই
চলন্ত ছবির ফ্রেমে ফুটে ওঠে অনাদি গঙ্গার
অন্তহীন উদাসীন স্রোত।
ছবি পালটে যায়।

ছবি পালটে যায়, তাই বুঝতে পারি, কোছাও চলেছি,
যদিও জানি না ঠিক কোথায়, কীভাবে;
এবং চলেছি বলে, মনে হয়, আজও বেঁচে আছি।
বেঁচে আছি, যদি একে বেঁচে থাকা বলে।

মণিভূষণ ভট্টাচার্য
(১৯৩৬)

সন্ধিক্ষণ

পরমায়ু অবিশ্বাস ক'রে
খোঁপা থেকে ঝ'রে যায় ফুল,
চাঁদ ওঠে বালির প্রান্তরে,
নীরবতা জড়ায় আঙুল।
রূপালি ফেনায় ডোবে রাত,
কাটে ডাল ক্ষয়িষ্ণু করাত,
বহুদূর চ'লে গেছে মূল—
হাওয়া আসে বারোটা নাগাদ।

উড়ে যায় রাত্রি আর চুল,
আনমনা চিবুকে বাঁ-হাত,
ভাঙে বুক ঢেউয়ের আঘাত,
ফুটেছিলো কাঁটা ও শিমূল।
ভাঙা নৌকো খুঁজে ফেরে ভাত,—
ছেঁড়া জাল, জ্বলেনা উনুন,
গোড়ালিতে চামড়া খায় নুন,
বঁটি আর থালাখানা কাৎ,
দক্ষিণের জোয়ারের গানে
হাওয়া আসে বারোটা নাগাদ।

জাগা-ই জীবন, তাই জাগি।
কৌশল পাল্টাই, নীতি নয়;

লগি ঠেলি, রক্ত মেশে ঘামে,
ঘুরে যাই অনিবার্য বামে,
দাঁড়-টানা খর খড়্গাঘাতে
ঘাতকের বিচ্ছিন্ন আবাদ,
সমুদ্র তো সশস্ত্র বৈরাগী,
হাওয়া আসে বারোটা নাগাদ।

গাছে গাছে রাত্রির আঁচড়,
নখ লাল নিঝুম কুমকুমে,
কোটাল ঘুমিয়ে পড়ে ঘুমে,
সারা সন্ধ্যে সিগারেটে ছ্যাঁকা খেয়ে খেয়ে
গ্লানিহীন স্বীকারোক্তিহীন
ঝাউবনে রাজবন্দি চাঁদ,
তিনদিকে গর্জে জলস্রোত—
দূর সিন্ধুসারসের গানে
হাওয়া আসে বারোটা নাগাদ।

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়
(১৯৩৬)

রাজছত্র খুলে

'ভালো হোক—' ডাক দিয়ে পাখি উড়ে গেল
দিনকিনারার দিকে। আজ আমার দান।
লুকোও অশিঙা পশু, জাঠধারী লোক।
খুঁটো পুঁতে পুঁতে রাখি আত্মযশ, ফিরে ফিরে দেখি
ডোরা জ্বলে কি না গায়ে। যে হও, যা হও,
মরুন্তে লোকের শাপ লাগবে না আজ।

চাঁচা-লেপা দু-প্রহর। রাজছত্র খুলে বসে আছি।
ছেঁড়া কানি ভরে ওঠো, ভরা থালা উড়ে এসো হাতে।
গায়ে ফুলে ওঠে ডোরা—সে যেন নরম-ফুল ধানছড়া।
ষোলো কলা চাঁদ জ্বলে ছাতার পেছনে,
পা-র গোড়ায় সাষ্টাঙ্গ টান হয়ে প'ড়ে ছায়া।
ডাল নাড়া দিয়ে মজা করে গেল রাতচর মড়া।
বুকে পাখসাট করে করে ওঠে অগতি হুতাশ।

চাতর খলবল করছে। কত দিক্কার বা-বাতাস
চালাচালি দান খেলছে পাশা-ছক পেতে।
আপন হাড়মাস চেটেপুটে খেয়ে, ছড়খানা বিছিয়ে
ঘুম যায় সাতকেলে জন আমার। জানে,
সাদা কালো মায়ারেখ গায়ে পুড়ে যায়?
কড়ি বুড়ি খুলে পড়ে বেসামাল ঘুমে,
জানে? ওই গড়ানে ঢালের মাথাসঁই

না-খাওয়ার ধন জমে জমে উঠছে সোনার জাড়িতে?
ঢাল বেয়ে খসে যাবে ঘুম ভাঙবার আগেভাগে?
সোনা দিপ্‌দিপ্ করে। রাজছত্র খুলে বসে আছি।
ওড়া ভরে ওঠো ফুলে, ভরা থালা ভরে ওঠো আরো।
গায়ে ফুলে ওঠে ডোরা—সে যেন নরম-ফুল ধানছড়া।
এতখানি সোনা গাঁথা ছাতার চুড়োতে,
দ্বীপ বেড় দিয়ে ফুলে ফুলে ওঠে বীজ, ফল, হত-ছিন্ন মাস।
ডাল নাড়া দিয়ে মজা করে গেল রাতচর মড়া।
বুকে পাখসাট করে করে ওঠে অগতি হুতাশ.....

দিব্যেন্দু পালিত

(১৯৩৬)

আমরা

আজ আবার আমরা বেরিয়েছি একসঙ্গে
অনেক দিন পরে
আমার সঙ্গে আমার স্ত্রী
আমার স্ত্রীর পাশে যে-লোকটি
সে যথাযোগ্যভাবে হয়ে ওঠার চেষ্টা করছে
আমার স্ত্রীর স্বামী

যেভাবে আমার পাশের মহিলাটি
অনেকক্ষণ ধ'রে চেষ্টা করতে করতে
ক্রমশ হয়ে উঠল তার স্বামীর স্ত্রী
এবং এইভাবে
দু'জন দু'জনকে নিয়ে ভাসতে লাগল
আহ্লাদে

অনেকদিন পরে আমাদের ছেলেমেয়েরা
ক্রমশ জুটে গেল আমাদের সঙ্গে
নিজেদের ভাইবোনদের দিকে তাকিয়ে
ক্রমশ নিজেদের চিনতে লাগল তারা
কখনো দূরে গিয়ে কখনো খুব কাছ থেকে
পরস্পরকে ছুঁয়ে বুঝতে চাইল
দূরত্ব কিংবা নৈকট্য আসলে বোঝাবুঝির ব্যাপার

তখন তাদের দেখাদেখি তাদের পাশে
জড়ো হ'তে লাগল আরো অনেকে

কেউ হামাগুড়ি দিয়ে কেউ কাঁদতে কাঁদতে
কেউ বা শুধুই একতাল মাংসপিণ্ডের আকারে
তাদের না-ফোটা চোখমুখ নিয়ে
এবং যে যেভাবে নির্ভরতা পেতে পারে সেইভাবে
পেতে লাগল নির্ভরতা

অনেকদিন পরে আমি ও আমার স্ত্রী
তাদের চিনতে লাগলাম একে একে
যারা আমাদের সন্তান ছিল এবং
যারা হ'তে পারতো আমাদের সন্তান
যাদের আমরা বাঁচতে দিয়েছি এবং
যাদের আমরা মেরে ফেলেছি স্বচ্ছন্দে
দরজা খুলে দেওয়া হাওয়ার মতো
তারা
দাপাতে লাগল আমাদের চারপাশে
শঙ্কা থেকে তাদের মুখ চুম্বন করতে গিয়ে
অনুভব করলাম আমাদের ঠোঁট আছে
আমাদের চোখ আছে
আছে দৃষ্টি

এবং তখনই অ্যালার্ম ঘড়ির মতো শব্দে
বেজে উঠল আমাদের হৃৎপিণ্ড এবং
অনেকদিন পরে
অনেক অনেকদিন পরে
চিৎকার ক'রে আমরা ডাকলাম পরস্পরকে
চলো আর অপেক্ষা নয়
আর অপেক্ষা নয়
আমরা এসে পড়েছি।

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত
(১৯৩৬)

আমি দিকচক্রবাল ঘুরে

আমি দিকচক্রবাল ঘুরে
এসেছি এখানে।
এখন আমার কিছু ব'লবার আছে।

সমুদ্র দেখেছি আমি। কালো আঙ্‌রাখা
সূর্যের ছোঁয়ায় কিছু লাল, কিছুটা বাদামী
হ'য়ে, ফের অন্ধকার হ'য়ে গেছে।
দু'একটা হাঙর খুব কাছে এসেছিলো।
আমি মৃত্যুর মুখোমুখি হ'য়ে, মৃত্যুকে পাল্‌টে দিতে
চেয়েছি তখনও
জল, স্বৈরিণী জল, অন্য কোনো প্রেমিকের দিকে
চ'লে যেতে চায়—আমি লক্ষ করেছি।
সিন্ধুসারস শুধু চোখ মেলে দেখে নিতে চায়
কোন দিক থেকে এসে, হাওয়া তার
পালক কাঁপাবে।
ঝাউবনে অনেক হৃদয় বাঁধা থাকে,
আমি রাস্তা দিয়ে যেতে, সব দীর্ঘশ্বাস
শুনতে পেয়েছি।

আমি দিকচক্রবাল ঘুরে
এটুকু বুঝেছি, প্রেমের কাঙাল এই মানুষেরা
দীর্ঘদিন একা একা থাকতে পারে না।

সে যেমন বৃক্ষ থেকে নীরবতা শেখে, মানুষীর কাছ থেকে
সে আবার চঞ্চলতা বুঝে নিতে চায়।
সে কখনো স্থির হয়, কখনো বা কিছুটা অধীর
হ'য়ে খোলা মাঠে পায়চারি করে।
দু'একটা উড়ন্ত মেঘ বৃষ্টি হ'য়ে ঝ'রে যাবে ব'লে
ধানের ক্ষেতের মতো সে কখনো উল্লসিত হয়।
তারপর বৃষ্টি নেমে আসে?
এইভাবে, জলে ও ডাঙায়
ঘুরে ঘুরে দেখেছি যে, মানুষের ভালোবাসা
এখনো কোথায় যেন বাধার সামনে এসে
হেঁট হ'য়ে আছে।
এখনো বাঁশির মতো ব্যাপ্ত হ'তে পারেনি চকিতে।
এখনো ঝর্ণার মতো স্বতশ্চল হয়নি জীবনে
এখনো অনেক কিছু বাকি র'য়ে গেছে।

আমি দিকচক্রবাল ঘুরে
এসেছি এখানে।
আমার ব'লবার ছিলো। আমিও কি
ব'লতে পেরেছি?

তারাপদ রায়
(১৯৩৬)

নিঝুমপুর

চলেছি নিঝুমপুর, নিঝুমপুর কোথায় কে জানে,
কে জানে?
তবু যেতে হবে, শালবন,
হয়তো ফুটেছে ফুল, শালফুল কখনো দেখিনি,
শালফুল হয়তো ফোটে না,
ফুটলেও যাবে না চেনা, কেন না এপথ
চলেছে নিঝুমপুর।
পথের পাশের শোভা, আকাশ বা পাখি
বাদাম গাছের নিচে বাদামি আঁধার
কিছুই দ্রষ্টব্য নয়।
নিঝুমপুর গ্রাম না নগর
কিছুই জানি না শুধু,
নিঝুম, নিঝুমপুর চলো, চলো, চলো।

আল মাহমুদ

(১৯৩৬)

মায়াবৃক্ষ

এতোদিন জল ঢেলেছি যার
গোড়ায়, এখন দেখি যে তার
পোকায় কেটেছে শিকড় সব;
অকালে শাখার পাতার স্তব
শুকাবে, এখন ভেবেই তল
পাইনে, বিফল করেছি কি
কোথায় ঢেলেছি পরম জল?
হৃদয় নিঙড়ে লাল তরল,
ভাবছি এবার ছড়িয়ে দিই
শরীর, মাংস চর্বি বল!

হায়রে এমন মোহিনী ছল
ছলবে আমাকে জানতো কেউ?
দুচোখে এমন করুণ ঢল
বহাবে জানলে আনতো কেউ?
দানবপুরীর সোনালি মূল?

তখন ভেবেছি সোনার গাছ
একদিন দেবে হিরের ফুল,
একদা মরমী হাওয়ার আঁচ
ফলাবে এ গাছে মুক্তো ফল,
আজ চেয়ে দেখি ভিজিয়ে ফুল
অফলার মূলে ঢেলেছি জল!

বিনোদ বেরা
(১৯৩৭)

সুন্দর

ঝরে পড়ছে বাঁশির ছিদ্র হতে
আকুল করা প্রাণের ছায়া-পেতে
খরস্রোতা সুর—
পাথুরে পথ বাজে ঘোড়ার ক্ষুর।

ডালে জাগলো ফুলের কচিকুঁড়ি
রোদ ছুঁইলো বনরেখারি চুড়ি,
উচ্ছ্বসিত গান
গুঁড়িয়ে দিলো সকল অপমান।

যে দিকে চাই স্বপ্ন-সফল-সোনা
বন বাগানে পাখির আলোচনা
শিশির হয়ে জ্বলে—
এই্ ধরাধাম ফেলে কি কেউ চলে!

ঝরে পড়ছে বাঁশির ছিদ্র হতে
পেখম মেলা ময়ূর মেঘ-স্রোতে
রৌদ্র কিরণ শালী—
আমি আমার ফুল বাগানের মালী।

প্রণব চট্টোপাধ্যায়

(১৯৩৭)

সংবাদ

আমার খিদের ভাতে মাঝে মাঝে
আঁকাড়া ভিক্ষের চালের গন্ধ পাই,
ছেলেটার মুখের কাছ বরাবর
সেই ভাত আনলেই আমার হাত পাথর;

যেখানে শৈশবের রত্ন মানিক মার্বেলের মতো
টলটলে জল ভর্তি নদী ছিলো
ছলাৎ ছলাৎ ঢেউ লাগত বুকে
তাতেও কেমন রক্ত রক্ত গন্ধ
হাজার পিপাসাতেও কেউ ছুঁয়ে দেখে না;

আমার পিঠটা ক্রমশঃ কুঁজো হয়ে যাচ্ছে
চারপাশে আমারই মতো
কিছু কুঁজো দিনরাত হাঁটছে চলছে
ফাই ফরমাস খাটছে;
অনেক কটা দিন গত হলে অবস্থাটা ভুলে
আবার চিত হয়ে শুতেও চাইছে;

কেউ কেউ লাফ দিয়ে দিব্যি
চাঁদের গায়ে হাত রাখছে
দশটা হাত ফেরতা কানাকড়িটাকে
মোহর ভেবে চুমু খাচ্ছে;

এক মায়ের পেটের ভাই সাবেক প্রতিশ্রুতিমতো
সময়ের গা থেকে ঘষে ঘষে
কালো রক্তের দাগ মুছছে
সে মুছেই যাচ্ছে;
দেশটা নাকি যুগপৎ কোনো প্রতাপান্বিত রাজার
আর গলির মোড়ে
ভুবনমোহিনী রাত কাটায় যে মা তার;
এঁদো গলির ন্যাড়া ছাদে বসে
অমন মায়ের এক ছেলে
এই সব বলে ইতিহাসের পড়া মুখস্থ করছিলো।

বিজয়া মুখোপাধ্যায়
(১৯৩৭)

কাঁধে হাত রেখে দাঁড়ায় সোমবার

আলো ফুটতে-না-ফুটতে কাঁধে হাত রেখে দাঁড়ায়
সোমবার।
একটু পরেই শুরু হবে মানুষজনের ছোটাছুটি
মিলেমিশে যাবে ঘাম, পারফিউম আর গাড়ির নির্বিকল্প
আওয়াজ
অথচ সোমবারের কোনো উপলক্ষ নেই
শ্যাওলা-কর্ডুরয় আর জারুলশার্টের ওপরে
দৃঢ় চোখে একটু বা ছায়া, চুপচাপ।
তিরস্কারের ছলে কিছু বলতে গেলেই ঠোঁটে আঙুল রাখে সে
আর তখনই ক্রমশ বড় হয়ে উঠতে থাকে
তর্জনী-চাপা ঠোঁট
যেন লালমাটির মৃদঙ্গ
যেন ফেটে-যাওয়া নির্মিত বেদানা
এবারে চোরকাঁটা বাছবার ছলে মুখ নামিয়ে বলি—
উপগ্রহশাসিত ভূগোলের ওপরে ব্যস্তসমস্ত
ঘুরে বেড়াচ্ছি আমরা
যেন জনাকয়েক পিগমি
কাজ নয়, সন্ত্রাসও নয়
সোমবার, আমাদের চরাচরের পাসপোর্ট
আমাদের প্রবাহমানতা—
শেষ করবার আগেই বেসমেন্ট থেকে
ভুশ্ করে উঠে আসে অন্ধকার
সোমবার চলে যায় কোন পরম্পরা না-রেখে।

নবনীতা দেবসেন

(১৯৩৮)

প্রভুর কুকুর

প্রভুর কুকুর হয়ে কেটে গেছে অগুন্‌তি বছর।
কেবল বাতাস শুঁকে শত্রুতার গন্ধ চিনে নেওয়া

তারপর অবিশ্রান্ত যুদ্ধের হুংকার, ছুটোছুটি
শিকার কামড়ে এনে শ্রীচরণে নম্র নিবেদন
অতঃপর লেজ নেড়ে পদতল চেটে
বকশিশের অস্থিখণ্ড মুখে ধরে চুষির মতন
তৃপ্ত শুয়ে-পড়া। এই ভাবে ক্লান্তিহীন অগুন্‌তি বছর
প্রভুর আদর।

এখন যৌবন গত। ভূতগ্রস্ত একক শিকারী
সারারাত্রি চতুর্দিকে দুর্নিবার শত্রুশব্দ শোনে—
জানালা-দরজায় টোকা, মেঝেয় কি ছাদে
দেওয়ালে দেওয়ালে শোনে পদশব্দ—
নিশ্বাসের বাতাসটুকুও, আকাশ, প্রান্তর, বনমালা
কদাচ শত্রুর বিষবাষ্পমুক্ত নয়।

সারাদিন ক্লান্ত, দীন, কেটে যায় আচ্ছন্ন নিদ্রায়
রাত্রিভোর অশরীরী পশ্চাদ্ধাবনা
অন্তহীন সীমার লড়াই।
আকণ্ঠ চীৎকৃত কান্না,
শূন্যভেদী বিলোল ধিক্কার।
বহুকাল প্রভুহীন, বহুকাল পথের কুকুর।

বহুকাল, নিজেই শিকার।

দেবারতি মিত্র
(১৯৩৮)

একটি বাজনা গাছ

সে যেন আরম্ভ হল এইমাত্র
মেঘঝোরা ঘিরেছে শ্যাওলা
পাথরের কথাবলা বনভূমি—
কেশর ফাটানো ফুল
তাম্ররেখা
স্ফুলিঙ্গের মতো ওড়ে রেণু।

ধূ ধূ শব্দে চারদিক কেঁপে ওঠে.......
অনেক গ্রীষ্মের শেষে তোমাদের আমলকী বাগানে
জংধরা শিকল জড়ানো পরিত্যক্ত কুয়ো—
বহু দূরে
লুপ্ত বালিকার চাউনির মতো চুপ জল,
আকন্দ পাতায় কাঁপা হালকা কর্পূর কণা কণা
আবছায়া তারাফুটকি সাপ।

আলতো সবুজ ঝিঝি থোকা থোকা
সমস্ত গা গুঞ্জরনময় একটি বাজনা গাছ
গোল ফোয়ারার মতো আকাশের নিচে
সে যেন আরম্ভ হল এইমাত্র।

সামসুল হক
(১৯৩৮)

খোকা ভাত খাবি আয়

অর্ধেক আকাশ গ্রামকে দান ক'রে বাকি-অর্ধেক নদীকে দেবে ব'লে
নিজের অধিকারে রেখেছে পূর্ণিমা
বুনো কচুপাতায় চারফোঁটা শব্দ টলটল করতে-করতে
ঘাসের ঠোঁটে ভেঙে পড়লো
বাতাস মেলায় তার সর্বস্ব দান ক'রে একবস্ত্রে ফিরে যাচ্ছে ওই
শুধু সরস্বতীনদী থেকে উড়ে-আসা একটা ছায়া
কানপেতে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে
সে কখন কাকে বলবে খোকা ভাত খাবি আয়

পূর্ণিমা শব্দ বাতাস ছায়া ওসব কিছুই নয়
বর্ণমালার মতন খুব ভুল
গ্রাম নদীর ভিতর সারাদিন খেলা করে শব্দ
সারারাত ঘাসের উপর ঘোড়া চরায়
বাতাস মেলায় গিয়েছিলো শুধু নাগা-সন্ন্যাসীর পায়ের তলায়
ঘুমিয়ে পড়বে ব'লে
মায়ের মুখাগ্নি করার সময় একটি শিশুর ঠোঁটে
শুধু সরস্বতী ফুটে উঠেছিলো
কেউ কখনো কাউকে বলেনি খোকা ভাত খাবি আয়

এসব জেনেও ভিখিরি-বালকের গলা থেকে ঝরে পড়ার লোভে
এক নিষাদ ক্রৌঞ্চ-ক্রৌঞ্চীর দিকে নিজের গার্হস্থ্য ছুড়েছিলো
একটা পাখি উড়ে যায় ভিখিরি-বালকের গলা খুলে দিতে
একটাকেই নিতে হয় সম্পূর্ণ আকাশ

আর ওই নিষাদ বহুক্ষণ নিজের স্বরলিপির দিকে তাকিয়ে থেকে
পিছন ফিরে হাঁটতে থাকে

সেও কি গ্রামের মতো খেলেছিলো পূর্ণিমার নদীর তলায় একা-একা
গৃহহীন পুত্রের মুখাগ্নি করার সময়
তার ঠোঁটেও কি সরস্বতী ফুটে উঠেছিলো
কেউই জানে না ওই ক্ষত্রিয়পুরুষ যাজ্ঞিক কৃষকরমণী
ওদের কাছেও তো ভিখিরি-বালককে পাঠাবার কথা ছিলো তার

ওই নিষাদ তার ঘাতক বীণায় টঙ্কার তুলে নিজের পাথুরে বুকের
ঘোর কাছাকাছি মুখ নিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে
খোকা ভাত খাবি আয়
আর সে এই প্রথম স্পষ্ট শুনতে পায় কে যেন তাকেই
চারফোঁটা টলটল শব্দে গোপন দূর থেকে বলছে
খোকা ভাত খাবি আয়

আর হঠাৎ ক্ষত্রিয়পুরুষ যাজ্ঞিক কৃষকরমণীর সামনে
ভিখিরি-বালক এসে পড়ে

৭.৭.১৯৭৮

রত্নেশ্বর হাজরা
(১৯৩৮)

সম্রাজ্ঞী

পুতুল তোর ঘরে আছে কিংবা তুই-ই পুতুলের ঘরে
বলা মুস্কিল—
এটাও হতে পারে   ওটাও অসম্ভব না
যদি বলি: তোর মন উড়ছে
বেলুন স্থির
কিংবা আকাশ বা সমুদ্র কোনোটাই নীল নয়
তোর চোখের রঙই অমনি
তাহলেও বোধহয় ভুল হবে না।

মধ্যরাত্রে কে আগে জাগলো   তুই না বাঁশি
বুঝলাম না আজও
সময়মতো কার ঘুম ভাঙে
কে কাকে জাগায়—
তখনকার গন্ধটা বাতাবীলেবুর ফুল থেকেই এসেছিল
না বাতাসই ছিল ওরকম—
কেন চিৎকার করলি: হাওয়া বন্ধ ক'রে দাও
আমার অঙ্গ জ্বলছে!

পর্বত শৃঙ্গ দেখেই তোর বুক গড়ে উঠলো   বিশ্বাস করি না
বরং তোর বুক দেখেই পাথর ভেবেছিল
অমনি হবো—
বলছি তো : সমুদ্র নয় আকাশও না
তোর চোখের রঙই অমনি
কিন্তু কে কাকে চেনায়।
বলা মুস্কিল।

কেউ একা কেউ অনেক

অনেকে অনেক কিছু পারে কিন্তু অনেকেই
বহু কিছু কখনো পারে না—

অনেকে কখনো একা হয় না অনেকে
সারাদিন একা থাকে
যাক সে বাজারে কিংবা খেলা দেখতে অথবা মেলায়
একা তার ঘুড়ি ওড়ে সন্ধ্যা হয় তার
বুকের ভিতর দীর্ঘলয়ে
ঘুঘু ডাকে—

অথচ অনেকে তার একাকীত্ব জানতেই পারে না
অজস্র হাতের শব্দ করতালি শুনতে পায়—
পড়ন্ত বিকেল দেখলে মনে পড়ে এই তো এক্ষুণি
কোনো মাঠে সভা হচ্ছে কোথাও মিছিল
কোথাও বিরাট মেলা ঘোড়াদৌড় সার্কাস বসেছে
এবং সবার সঙ্গে হাঁটা তার
ঘুমের মধ্যেও
আছি তোমাদেরই সঙ্গে এমনি শব্দ ওঠে—

অনেকে অনেক কিছু জানে কিন্তু অনেকেই
বুকের ভিতরে রোজ ঘুঘু ডাকছে জানতেও পারে না
অথবা যে হেঁটে যাচ্ছে অনেকেই সঙ্গে সারাক্ষণ—

তুষার রায়
(১৯৩৮)

কবিতাই ক্রমশ

কবিতা লিখতে আজকাল, প্রথমাংশ থেকেই ভয়
কেননা প্রত্যেকটা লাইন পংক্তি আপনি ভাঙছে বিভাজনে
অনুঘটনও সমান তালে, শক্তির যেন শ্যাফট খুলে যাচ্ছে
কবিতা নিয়ে শেষপর্যন্ত ব্যাপার দাঁড়াচ্ছে বিস্ফোরকের হাতল
যেন বোম বাঁধবার মতো খানিকটা
আকর্ণ আতা দাঁত বের করে রোমান্টিক হতে গেলে
দন্তপংক্তি ঝরে যাচ্ছে

নেশা জরাতে গেলেই কবিতা বুমেরাং যেন অস্ত্র, কিংবা
সোনা সাফ করতে এ্যাসিড, যেমন মারাত্মক ধোঁয়া বেরোয়
যেন দেহ ঘ্রাণ গান রক্তমাংস পুড়ে উঠছে ধোঁয়া এমন সিপিয়া রং ধোঁয়ায়,
কবিতাই তখন গঙ্গার মতো সাফ করছে ফেঁশো পাটকাঠি
ময়লা কালো ঝুল যতো,
কবিতাই ক্রমশঃ গঙ্গার মতো তর্পণ করাচ্ছে তীরে, যখন
ডুব দিয়ে উঠলেই মনে হচ্ছে মন্দির দেখবো সামনে, কিন্তু
চোখ খুলতেই ঝলসে উঠলো ভেসে যাচ্ছে মড়ার পেটে কাক
এবং ড্রেজার ঝনঝন কাজ চলছে ভড় নৌকা খড়ের গাদায়
রন রন করছে রোদ,
আবার ডুবছি, ভয়ে ভাবছি, এবার মাথা ভাসালেই দেখতে পাবো
নিজের শরীর ভেসে যাচ্ছে, সোনা গলানো গঙ্গা যেন
এ্যাসিড হয়ে ফুটে উঠেছে
গাঢ় বাদামী বিষাদ ধোঁয়ায় ঢেকে যাচ্ছে ব্রিজ।

অনন্ত দাশ
(১৯৩৯)

সেই মানুষ

যে মানুষ লুকিয়ে থাকে মুখোশের কঠিন আড়ালে
আমি তাকে হন্যে হয়ে খুঁজি
তার কোনও ঠিকানা নেই
নির্দিষ্ট বাসস্থান নেই
তার মন আকাশের মতো উঁচু
দিঘির জলের মতো স্বচ্ছ, গভীর তার বোধ
মুক্ত চিন্তার সেই মানুষ
কালেভদ্রে পৃথিবীতে আসে—

মানুষের ভিতরে লুকিয়ে থাকে প্রকৃত মানুষ
যেমন জলের ভিতরে জল
আগুনের ভিতরে আগুন
মেঘের ভিতরে মেঘ

একদিন সেই জল
ভেঙে জলোচ্ছ্বাস ওঠে
আগুন থেকে হয় অগ্ন্যুৎপাত—
মেঘ থেকে
বিদ্যুৎশিখার মতো
সে একদিন জ্বলে ওঠে
আকাশ কিনারে
স্মৃতি ফুঁড়ে
দিগন্তের ফুসলে নেওয়া চাঁদের মতো
স্বার্থান্বেষীদের ভিড়ে
জ্বলজ্বল করে ওঠে
সেই মানুষ
উদার ও মানবিক—।

পবিত্র মুখোপাধ্যায়
(১৯৪০)

যদি যেতে হয়

যদি যেতে হয় তবে যাবো ওই মানুষের কাছে
বৃক্ষের ছায়ায় দাঁড়াবো না
বৃক্ষ কি রক্তাক্ত হলে চুম্বনে নিষিক্ত করে মাথা?

আমি ওই সমুদ্রে যাবো না
সমুদ্র আপন দম্ভে চুর হয়ে থাকে ক্ষমাহীন
মেটাতে পারে না তৃষ্ণা যেরকম মানুষ মেটায়

আমি ওই উদাসীন দেবতার দুয়ারে প্রার্থনা
জানাবো না ওইখানে উপেক্ষিত মানুষের মহৎ হৃদয়
যদি যেতে হয় তবে যাবো ওই মানুষেরই কাছে
বৃক্ষ যা পারে না তা সে দিতে পারে সমুদ্র যা দেয়
কিংবা দেবতারা অনায়াসে তা সে
দিতে পারে দিতে চায়
বুক পেতে বজ্র নিতে পারে
আমাকে আশ্রয় দেবে ভেবে নিজে হয়েছে দধীচি

এখন রক্তাক্ত হলে বৃক্ষ নয় মানুষেরই ছায়ায় দাঁড়াবো।

জেনে গেছি বলে

জেনে গেছি বলে কোনো দুঃখ নেই
দুঃখরোগ কবে সেরে গেছে
ঢেউয়ের চূড়ায় আমি ভাসমান ভুশণ্ডী প্রবীণ
শেষতম অভিজ্ঞতা আমাদের ন্যুব্জ দেহে
অস্থি ও মজ্জায় নার্ভতন্ত্রে মিশে আছে

উজ্জ্বল শতক কিংবা সুবর্ণ যুগের দূর বাতিঘর টাওয়ারের চূড়া
অবচেতনার স্তরে ফেলে রেখে কি রকম প্রবীণ হয়েছি
আজকের মানুষের প্রবীণতা সময়েরই শেষ পরিণাম

জেনে গেছি বলে হ্রদ নিস্তরঙ্গ
আকাশের প্রতিশব্দ নিখিল শূন্যতা
জন্মের মুহূর্ত হতে পুড়ে যায় সর্বভুক সূর্যের শরীর
বিবর্ণ পুঁথির শব্দে অর্থহীন প্রতিশ্রুতি স্থির হয়ে আছে
আমারে রক্তে কোনো সে রকম প্রতিশ্রুতি নেই
আমাদের রক্তে নেই লোহিতকণিকা
মেরুদণ্ডে করোটিতে পাঁজরে বুকের হাড়ে কীটের সংসার
দিনে দিনে বাড়ে আর
বাগানের শিশুবৃক্ষ ক্রমশ হলুদ হয়ে যায়
কোথাও বসন্ত নেই জেনে বাসা ভেঙে দিয়ে পাখিরা পালায়

জেনে গেলে বেড়ে যায় বয়সের ভার
অতিকায় অভিজ্ঞতা আমাদের নিয়ে চলে সমাপ্তিরেখার
খুব কাছাকাছি
ক্রমে ফুসফুসে তুষার ঢল
সমাধিভূমির রাত্রি ভারি হয়ে নামে
লাথি মেরে ভেঙে দিই লাল নীল কাচের জানালা
যাদুদণ্ড ছুঁড়ে দিয়ে নির্বোধ শিশুর হাতে
বুকে কান পাতি
খাঁ খাঁ করে নদীর কোমল জল জলের গভীর উৎস উৎসের জলদ
হু হু হাওয়া সমস্ত বৃক্ষের মাথা থেত্‌লে ছুটে যায়

হস্তিনা পেছনে ফেলে ধৃতরাষ্ট্র চলে যায় জেনে গেছে বলে।

গণেশ বসু
(১৯৪০)

সমুদ্রমহিষ

মাঝে মাঝে ক্ষেপে ওঠে শিরাফোলা সমুদ্রমহিষ
আমার ভেতর বুকে ফসফরাস,
রক্তে টান প্রবলতা, বিস্ফোরণ ঘটে যায় যেন
আকাশ পাতাল জুড়ে, চুল ছেঁড়ে, বাহুর পারদে
ভয়ংকর অস্থিরতা, বিধ্বস্ত চোয়াল।

তখন নিজেকে বড়ো অপরাধ, ছত্রীসেনা নেমে পড়ে কোনো
পর্দার আড়ালে বুঝি সুবিধাদানের
ভূমিকায়, পরস্পর বিপ্রতীপ কোণে
সব চেনা মুখে তাই ধ্বংসের স্যাবার
ছুটে চলে, কেউ খোঁজে কংকালের কঠিন বিবর
বিমিশ্র হৃদয়ে শুধু অসহায় আর্তনাদে, আর
উর্ণাজাল উত্তরে দক্ষিণে।

এখন রক্তের মধ্যে শ্বাস ফেলে দুরন্ত মহিষ।।

১৯৬৬

রবীন্দ্রনাথ

তাঁর হাতে ছিল মন্দিরা
তাঁর সুরে ছিল ব্যঞ্জনা
তাঁর কাছে খুঁজি ভাষার শিকড়
যাবতীয় শোকে সান্ত্বনা।

তিনি আমাদের স্বপ্নের
তিনি আমাদের নিশ্বাস
তিনি অপরূপ সঙ্গতি এক
চিরায়ুষ্মান বিশ্বাস।

তিনি জীবনের সংগীত
তিনি সত্তার নির্ভর
তিনি মুক্তির পথনির্দেশ
তিনি চলমান সুন্দর।

শহীদ কাদরী
(১৯৪২)

কোনো ক্রন্দন তৈরি হয় না

একটি মাছের অবসান ঘটে চিকন বটিতে,
রাত্রির উঠোনে তার আঁশ জ্যোৎস্নার মতো
হেলায়-ফেলায় পড়ে থাকে
কোথাও কোনো ক্রন্দন তৈরি হয় না,
কোথাও কোনো ক্রন্দন তৈরি হয় না;

কবরের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে প্রবেশ করে প্রথম বসন্তের হাওয়া,
মৃতের চোখের কোটরের মধ্যে লাল ঠোঁট নিঃশব্দে ডুবিয়ে বসে আছে
একটা সবুজ টিয়ে,
ফুটপাতে শুয়ে থাকা ন্যাংটো ভিখিরির নাভিমূলে
হীরার কৌটোর মতো টলটল করছে শিশির
এবং পাখির প্রস্রাব;
সরল গ্রাম্যজন খরগোশ শিকার ক'রে নিপুণ ফিরে আসে
পত্নীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে, চুল্লির লাল তাপে
একটি নরম শিশু খরগোশের মাংস দেখে আহ্লাদে লাফায়
সব রাঙা ঘাস স্মৃতির বাইরে পড়ে থাকে
বৃষ্টি ফিরিয়ে আনে তার
প্রথম সহজ রঙ হেলায়-ফেলায়

কোথাও কোনো ক্রন্দন তৈরি হয় না,
কোথাও কোনো ক্রন্দন তৈরি হয় না।।

মঞ্জুষ দাশগুপ্ত
(১৯৪২)

এসো

শান্তি পায়রার দেশে তুমি কেন আতঙ্ক ছড়াও?
নাও
বুদ্ধের মুদ্রিত চোখ থেকে
করুণাপ্রতিম আলো নাও
বৃষ্টিতে সন্ত্রাসরক্ত কালো মুখ মুখোশ আড়ালে
ঢেকে নাও
পাপ উল্কি ঢাকা পড়ে যাক
ফুলের কৌতুক থাক মিশে থাক
তোমার সে আত্মজিজ্ঞাসায়
কলঙ্কী চাঁদেরও চোখ ঝুলে থাকে ডালে
তুমি কি দেখোনি
দূরে জল জল আয়নায়?

অথবা এবং কিংবা
মরুঝড় তাড়া করে নিয়ে যাবে শূন্যতার কাছে
কিন্তু জেনো জীবনে ফেরার জন্যে দূরপথ ঘুরপথও আছে

শান্তিপায়রার দেশে পিঁড়ি পেতে বসবে কি দাওয়ায়!
ছেঁড়া শাড়ি অপেক্ষার আঁচল ছায়ায়।

জিয়াদ আলী
(১৯৪৩)

তাকে চাই

শ্রমের সহজ মূল্যে সবকিছু কিনে নেওয়া যায়?
প্রভাতী সূর্যের রঙে জেগে ওঠা চাষিবউ
কলের মজুর
পাখির ডানায় মাখা নিদ্রার আবেশ
নদীর জলের মধ্যে ফেনায়িত আবেগের
তীব্রতম ঘ্রাণ
সন্ধ্যার শিশিরে ভেজা ঘাসের নম্রতা?

কে থাকে বন্ধক কার কাছে
মানুষ না মানুষের
নিজস্ব সময়?

ও সব নিগূঢ় প্রশ্ন যে শেখায় প্রথম সংকেতে
তার নাম মে দিবস
তাকে চাই অমল উদ্ভবে।

দীপেন রায়

(১৯৪৩)

রুগ্ন হাসপাতাল

কেউ কেউ এখন অসম্ভব মূক ও বধির—
নিষ্ঠুরতা ছাড়া চরিত্রের অন্য ভাষা নেই।
বরফ ঠাণ্ডার রাত—আমরা হিম হয়ে গেছি,
আর যাদের কথা বলার জিভ ছিল না তারা সঞ্চালক।

ভয় আমার ভিতরের ছায়া পায়ের শব্দের মতো—
দুপুর সমুদ্রের পাখি ভেসে আছি
বর্ণময় নক্ষত্রের আকাশ ও অবসন্ন শিথিলতায়—
কেউ তো ভাবে না—চরিদিকে হাত-পায়ের নখের মতো ধার্মিক সন্ত্রাস।

আমরা উশখুশ করছি ফাটা যন্ত্রণায়
আর কেবলই ভয় পাওয়াচ্ছে আমার অন্ধ সাহস।
কেউ বানিয়ে রেখে গেছে শব্দ শোষণ করে
নিশুতির মতো একটা কালো পাথর।

যেখানে কোনও ওষুধ নেই, পথ্য নেই, ডাক্তার আসে না
এই এক বিস্তীর্ণ হাসপাতালের কোনও পরিষেবা নেই,
কেবল সন্ধ্যা হয় এখানে যার যেমন খুশির মতো।

মহাদেব সাহা
(১৯৪৪)

ভালোবাসার আয়ু

ভালোবাসি বলার আগেই
ফুরিয়ে যায় আমাদের ভালোবাসার সময়,
প্রেমের আগেই শুরু হয়
অনন্ত বিরহ—
মনে হয় সবচেয়ে কম মানুষের এই ভালোবাসার সময়
খুব দ্রুত শেষ হয়ে যায় তার আয়ু;
মানুষ মিলন চায়, কিন্তু তার বিচ্ছেদই নিয়তি।

কোনও একদিন সময় করে যে
বলবে ভালোবাসি
বলবে যে ভালোবাসা চাই,
এতটা সময় কই
ভালোবাসা বলার আগেই দেখবে ফুরিয়ে যায়
ভালোবাসার সময়,
শেষ হয়ে যায় তার আয়ু।

রফিক আজাদ
(১৯৪৪)

আমরা খুব ছোট হ'য়ে গেছি

আমরা খুব ছোট হ'য়ে গেছি—যেদিকে তাকাবে তুমি
দেখতে পাবে ক্ষুদ্রের বিস্তার! দুনিরীক্ষ্য মহীরূহঃ
গায়ক পাখিরা বসে, কখনো কি, আগাছার ঝাড়ে?
চতুর্দিকে বামন, বামন শুধু—ওসারে-বহরে,
দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে, সবদিকে যে কোনো বিচারে মেপে দ্যাখো
সব, সবকিছু ছোট হ'য়ে গেছে—বস্তু বা মানব!
আগেকার মতো বড়-মাপের মানুষ পাওয়া ভার—
চারদিকে গিসগিস করে লোক, লোকের দঙ্গল!
সকলেই ন্যুব্জপীঠ—কই সেই প্রকৃত পুরুষ?
ট্যাঁড়া পিটে-পিটে, কাগজেরা, যাদের করেছে বড়—
ফাঁপিয়ে চুলের গুচ্ছ যারা আজ ঐ বাড়িয়েছে
সামান্য উচ্চতা—মনোযোগ সহকারে তুমি যদি
মিটারে-লিটারে মাপো, মেপে দ্যাখো তরলে-নিরেটে-
দেখবে তারা কতো ছোট—তুচ্ছ, শুষ্ক তৃণেরও অধম!
তুমুল রোহিত নয়—শফরীর মতো তড়পায়
গণ্ডূষ জলের মধ্যে এইসব ছোট-র দঙ্গল!
ডাঙার কথাই ধরো—লক্ষণীয় বনভূমি কই?
এই ক্ষুদ্র বামনের দেশে শাল ও সেগুন নেই—
গজারিরও দারুণ অভাব! কী ক'রে হবে তা বলো
তোমার দু'চোখ জুড়ে শুধু হাহাকারময় মাঠ—
আগাছায়, তুচ্ছ তৃণে ভ'রে আছে জায় ও জঙ্গল!
রাস্তাঘাটে শেয়াল-কুকুর পরছে মনুষ্য-সাজি,
মনুষ্যত্বহীন মানবমিছিল আছে; এই গ্রহে
এই কালে মানবিক মঙ্গলের কথা বলতে পারা
মানুষ বিরল : ছোট হ'য়ে গেছে সব! অতঃপর,
কোকিলের ছদ্মবেশে দাঁড়কাক বসেছে শাখায়!

ভাস্কর চক্রবর্তী
(১৯৪৫)

নিজস্ব চ্যানেল

না-লিখে সাত আট মাস ঘেমো জীবনের দিকে তাকিয়ে রয়েছি
আধপাগলেরা সব লাফ দিয়ে রাস্তায় নেমেছে
সেইসব মেয়েরা কোথায় আজ স্বপ্নে যারা দেখা দিত এসে
মনে পড়ে, আলো-জ্বলা
লম্বা এক ফাঁকা রাস্তা, মধ্যরাত, আর আমি
গরুর কাশির মতো গড়িয়ে চলেছি—
এখানে ফুলের গন্ধ উবে গেছে
রঙচটা চায়ের গুমটির পাশে আমার বিকেলগুলো যায়
ওই তো ছেলেবেলার হাসি-ভর্তি মুখটাকে দেখতে পাচ্ছি আমি
কে চায় ধাস্টামো করতে, মনে রেখো
হাত একটু ফসকে গেলেই, ঘুম শুধু
কোটি কোটি বছরের মতো শুধু জলপ্রপাতের নিচে ঘুম।

কৃষ্ণা বসু
(১৯৪৭)

চাঁদ বণিকের ডিঙা

আমি চাঁদ বণিকের ডিঙা,
নদীর নির্জনে ডুবে আছি বহুদিন!
সারা গায়ে শ্যাওলা ধরেছে,
চুপ করে পড়ে থাকি ঠাণ্ডা কালো জলের গভীরে,
মাছেরা ঠোক্কর দেয়, ডিম পাড়ে, ছানাপোনা নিয়ে ঘর বাঁধে,
বণিকের নৌকাখানি থিতু হয়ে বসে থাকি জলের কালোয়।
মাঝে মাঝে তীব্র ইচ্ছা নাচায় তরঙ্গ, জলকণা,
দূর থেকে ক্ষীণ হয়ে ভেসে আসা ঢাকের গর্জন।
ইচ্ছে হয় ভেসে উঠি শরতের হিরণ রোদ্দুরে,
সাদা গরিমার পাল তুলে ভেসে যেতে ইচ্ছে হয়
ব্রহ্মদেশে জম্বুদ্বীপে শ্রীলঙ্কার বন্দরে বন্দরে।
শরীরে স্বর্ণের ভান্ড, তিসি, মোম, লাক্ষারস, মধু,
রেশম বস্ত্রের বিভা, দারুচিনি, কর্পূরের ভাঁড়,
মাঝি-মাল্লাদের গায়ের আমিষ গন্ধ,
চাঁদ বণিকের জেদী কণ্ঠস্বর সঙ্গে নিয়ে ভাসি
নদীর নরম ছেড়ে সমুদ্রের নুনে!

আঃ, পালে এসে লেগেছে বাতাস,
শঙ্খচিল উড়ছে মাথায়, তীর ক্রমশ ঝাপসা হয়ে আসে,
নীল নোনা ঢেউ এসে ভালোবেসে জড়ায় শরীর;
বাংলার গান গায় বড় মাঝিটির কালো ছেলে,
সে প্রথম এবারেই চলেছে সাগরে!

ঢাকের প্রখর শব্দ ভেসে আসে, জল ছুঁয়ে যায়,
গ্রাম বাংলায় পুজো এল।
নদীর নির্জনে ডুবে সব টের পাই,
কতদিন ডুবে আছি চাঁদ বণিকের ডিঙাখানি,
হায়, উড়তে ভাসতে ভুলে গেছি।

রাণা চট্টোপাধ্যায়
(১৯৪৮)

অবগাহনের আশায়

মৃত্তিকালগ্ন থাকি
যে কোনও ঝড় উড়িয়ে নেয় না।
অবগাহনের দিন
পৌঁছে যাবো অনন্তসাগরে।

এখন যদিও চারপাশ থমথম করছে
বিষাদের রঙ অপমানে-অপমানে
বেশ গাঢ় হয়েছে
কবিতার নামে যাবতীয় ভ্রষ্টাচার দেখি
কবিতার ওড়না থেকে যশরাশি উড়ে যায়
কোন ফাঁকি নীড়ে!

আমি শূন্যে বাবিলনের আশ্চর্য উদ্যান দেখিনি
পরীর ডানা থেকে আদিম ভালোবাসা ঝরে পড়ছে
সমস্ত দিন আর এক একটা মেধাবী রাত
ঢুকে যচ্ছে নিশাদল—মরীচিকার ভেতর।
তাই মৃত্তিকালগ্ন থাকি
অতো বড়ো আকাশ ষোড়শ উপচারে
কাকে পূজা করে?
ব্যথাগুলি কার কাছে জমা রাখে!

আমি বেশ আছি
নিজেকে টেনে নিয়ে যাইনি বাদাবনে
মৃত্তিকা সম্পৃক্ত আজো
কলিজা ফেটে রক্ত বেরুলেও আনন্দে থাকি
ইঁদুরেরা দৌড়চ্ছে দৌড়োক
কাল অবগাহনের আশায় দূর সমূদ্রে যাবো।

রণজিৎ দাশ
(১৯৪৯)

সন্ধ্যার পাগল

যেভাবে ফুটপাতে বসে মাথা নাড়ে সন্ধ্যার পাগল
আর বিড়বিড় করে কথা বলে রাক্ষস ও ডাইনিদের সঙ্গে—
সেভাবেই দিন কাটে আমার। আমি ব্রিফকেস হাতে
অফিস থেকে ফেরার পথে আচমকা ভয় পাই আজ
দেখি, ওই পাগলের এক-একটি মাথা ঝাঁকুনিতে
কেটে যাচ্ছে আমার এক-একটি দিন
দেখি, ওই পাগলের এক-একটি মাথা-ঝাঁকুনিতে
কেটে যাচ্ছে আমার এক-একটি জীবন—
দেখি, ওই পাগলের মাথায় লেগে
গির্জার মাঠের গোলপোস্টে ঢুকে যাচ্ছে পূর্ণিমার চাঁদ

আমি ব্রিফকেস ছুঁড়ে ফেলে, ডাস্টবিনের কুকুরগুলোর পাশে
হাঁটু গেড়ে বসি, আর
ওই ঝাঁকড়া-চুলো পাগলের দুলতে থাকা মাথা প্রাণপণে বুকে চেপে ধরি

কয়েকটা মুহূর্ত শুধু এইভাবে
প্রগাঢ় শান্তির মধ্যে বেঁচে থাকি, তারপর মরি।

নির্মলেন্দু গুণ
(১৯৫২)

একজন কবির সাক্ষাৎকার

: আচ্ছা, এককথায় কবিতা বলতে আপনি কী বোঝেন?
— মানুষ।
: আপনার কবিতায় রাজনীতির ব্যবহার খুব বেশি,
মনে হয় শিল্পের ব্যাপারটাকে — এর কারণ কী?
— মানুষ।
: স্বর্গ, নরক — এসব বিষয়ে আপনার চিন্তা জানতে
ইচ্ছে করে। একটু সহজ করে বুঝিয়ে বলুন।
— সহজ করে বললে বলতে হবে, মানুষ।
: মানুষের মৃত্যু হলে পরে, কিছু ভেবেছেন কি?
— ভেবেছি, তারপরও মানুষ।
: সব প্রশ্নের উত্তরই যদি মানুষ, তাহলে এবার বলুন,
মানুষ বলতে আপনি কী বোঝেন?
— সমাজবদ্ধ শ্রমজীবী মানুষ।
: তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়ালো শেষ পর্যন্ত?
— দাঁড়ালো না, চলতে থাকলো।
: মানলাম চলতে থাকলো, কিন্তু কে মানুষকে দিলো
তার এই অন্তহীন চলার গতি? সেকি কোনো পরমশক্তি?
— হাঁ, মানুষ এক পরম শক্তিই তো। ঠিকই বলেছেন।
: তার মানে, আপনি বলতে চান এই সুন্দর পৃথিবী,
এই মহাশূন্যমুগ্ধসৌরলোক, এই মৃত্তিকা, এই আকাশ,
বাতাস—এগুলো সৃষ্টি করেছে মানুষ?
— হাঁ, মানুষ।
: বলুন, কীভাবে? কীভাবে?
— সন্তান যেভাবে সৃষ্টি করে তার মাতাকে, পিতাকে।

জয় গোস্বামী
(১৯৫৪)

মালতীবালা বালিকা বিদ্যালয়

বেণীমাধব, বেণীমাধব, তোমার বাড়ি যাবো
বেণীমাধব, তুমি কি আর আমার কথা ভাবো
বেণীমাধব, মোহনবাঁশি তমাল তরুমূলে
বাজিয়েছিলে, আমি তখন মালতী ইস্কুলে
ডেস্কে বসে অঙ্ক করি, ছোট্ট ক্লাসঘর
বাইরে দিদিমণির পাশে দিদিমণির বর
আমি তখন নবম শ্রেণী, আমি তখন শাড়ি
আলাপ হলো, বেণীমাধব, সুলেখাদের বাড়ি

বেণীমাধব, বেণীমাধব, লেখাপড়ায় ভালো
শহর থেকে বেড়াতে এলে, আমার রঙ কালো
তোমায় দেখে এক দৌড়ে পালিয়ে গেছি ঘরে
বেণীমাধব, আমার বাবা দোকানে কাজ করে
কুঞ্জে অলি গুঞ্জে তবু, ফুটেছে মঞ্জরী
সন্ধেবেলা পড়তে বসে অঙ্কে ভুল করি
আমি তখন নবম শ্রেণী, আমি তখন ষোলো
ব্রীজের ধারে, বেণীমাধব, লুকিয়ে দেখা হলো

বেণীমাধব, বেণীমাধব, এতদিনের পরে
সত্যি বলো, সেসব কথা এখনো মনে পড়ে?
সেসব কথা বলেছো তুমি তোমার প্রেমিকাকে?

আমি কেবল একটি দিন তোমার পাশে তাকে
দেখেছিলাম আলোর নীচে: অপূর্ব সে আলো।
স্বীকার করি, দুজনকেই মানিয়েছিল ভালো
জুড়িয়ে দিলো চোখ আমার, পুড়িয়ে দিলো চোখ
বাড়িতে এসে বলেছিলাম, ওদের ভালো হোক।

রাতে এখন ঘুমোতে যাই একতলার ঘরে
মেঝের উপর বিছানা পাতা, জ্যোৎস্না এসে পড়ে
আমার পরে যে-বোন ছিলো চোরাপথের বাঁকে
মিলিয়ে গেছে, জানি না আজ কার সঙ্গে থাকে
আজ জুটেছে, কাল কী হবে? — কালের ঘরে শনি
তবু আগুন, বেণীমাধব, আগুন জ্বলে কই?
কেমন হবে আমিও যদি নষ্ট মেয়ে হই?

রয় যে কাঙাল শূন্য হাতে

এসেছি যখন, খালি হাতে ফিরব না
হাতের সামনে যা পাচ্ছি নেব তাই
একাই নেব না, ভাইকেও দেব, ভাই দেবে তার বোনকে
দিয়েছি যখন ফিরিয়ে নেব না মনকে
এসেছি যখন, ফিরব না খালি হাতে
ধুলো ছুঁড়ে দেব মৃত্যুর গায়ে, স্বামী-ছেড়ে-যাওয়া মেয়েটির পায়ে
ও চলে আসুক আমাদের কাছে, আমি আর ভাই বেঁধে দেব ওর ঘর
এসেছে যখন আমরা দু-জন, দু-জনেই ওর বর

পেয়েছি যখন, ফেরার না হাত খালি
বাগানকে দেব সুন্দরমতো মালী
দিন রাত্রির নেশা করে করে, যত ছেলেপুলে রাস্তায় ঘোরে
সব ধরে ধরে বাড়িতে তুলব, বাড়ি হয়ে যাক খোলা মাঠ আর
মাঠ ঘিরে দিক বন
বনে জঙ্গলে আমরা ঘুরব, প্রতিমুহূর্ত অভূতপূর্ব, আমরা ঘুরব
আমরা আমরা আমি আমি আমি...........

আমার সঙ্গে আমিই থাকব ওগো অন্তরযামী।

কবি

জলে ভাসমান কাঠ। কাঠে বসল পাখি
ডানা ঝাপটে নিলো, আর
পাশে পাশে ভেসে যাওয়া
কচুরিপানার ঝাঁকে
ঠুকরে পেলো সাহসী ফড়িং।

কবিও চলন্ত কাঠে বসে আছে।
চারিদিকে খাঁ খাঁ সমুদ্দুর
থেকে থেকে ভাগ্য ঠোকরায়
কাঠ বা সমুদ্র খুঁড়ে যদি সে হীরের খণ্ড
ঠোঁটে তুলতে পারে কোনো দিন।